পাঠকদের প্রতি নিবেদন

ফাল্গুন সংখ্যা (মার্চ মাস) থেকে 'পরিচয়' বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হবে। বর্তমানে 'পরিচয়' ছাপা হয় নিউজপ্রিন্টে, বিজ্ঞাপনসহ পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিয়ানব্বই। পরবর্তী সংখ্যা থেকে 'পরিচয়' ছাপা হবে এ্যান্টিক কাগজে, বিজ্ঞাপন ছাড়া পৃষ্ঠা সংখ্যা হবে কমপক্ষে একশো আঠাশ পৃষ্ঠা। প্রতি সংখ্যায় অন্তত একটি চিত্রের প্রতিলিপি থাকবে। প্রচ্ছদ নতুন হবে।

*

নিয়মিত বিভাগ

১। বিজ্ঞান। ২। সমসাময়িক সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর ওপর ব্যঙ্গাত্মক রস-রচনা। ৩। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর পর্যালোচনা। ৪। চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ। ৫। নাট্যপ্রসঙ্গ। ৬। চিত্রপ্রসঙ্গ। ৭। সঙ্গীত প্রসঙ্গ। ৮। সাম্প্রতিক-সাহিত্য। ৯। পুস্তক-পরিচয়। ১০। পত্রিকা-প্রসঙ্গ ইত্যাদি। এবং কয়েক সংখ্যা অন্তর রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রসঙ্গে আলোচনা।

*

তাছাড়া

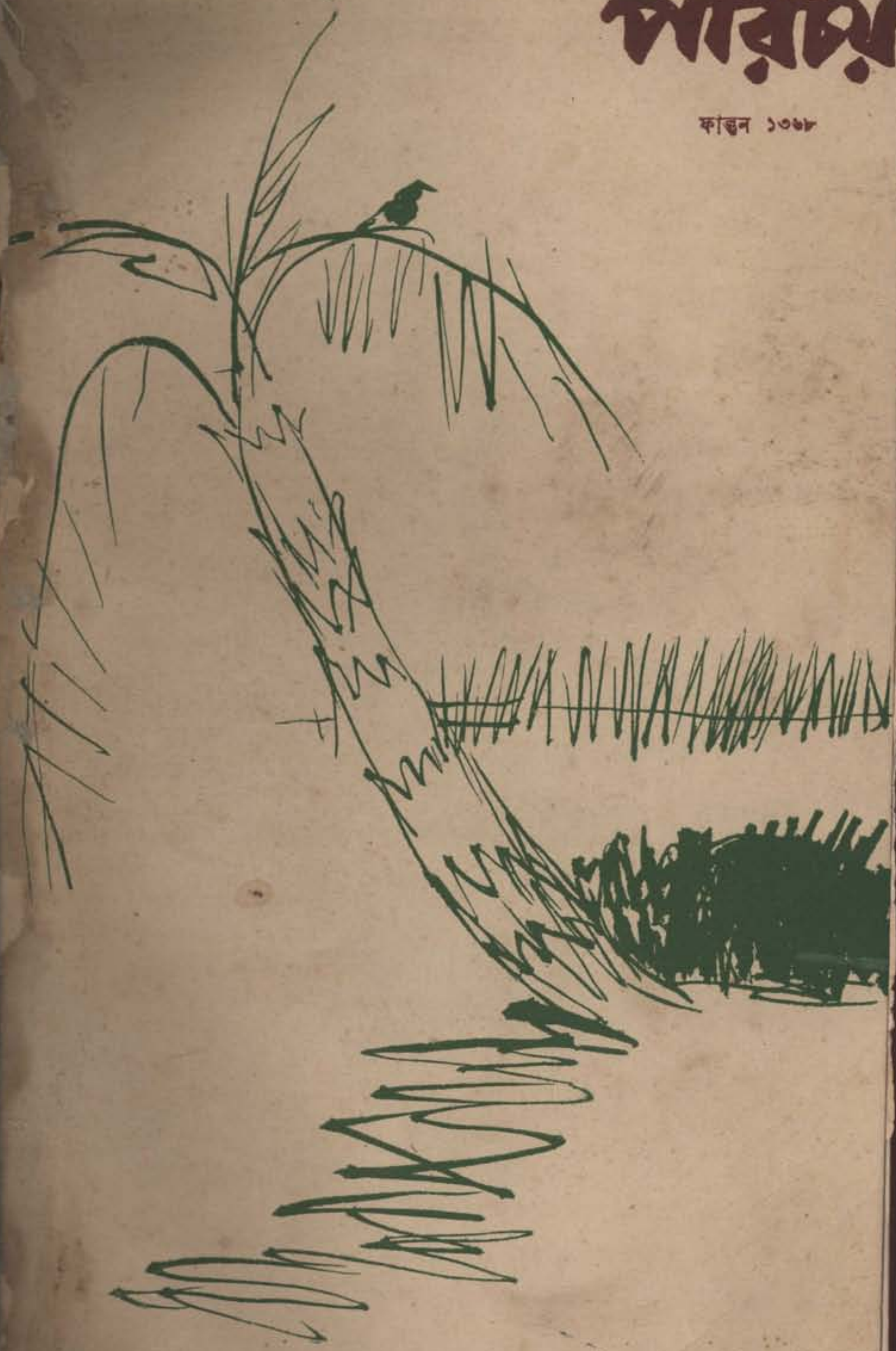
প্রবন্ধ। কবিতা। কাব্যনাট্য। ধারাবাহিক উপন্যাস। একাঙ্কিকা। গল্প। বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ।

দীর্ঘ তিরিশ বছরে বাংলা সাহিত্যে 'পরিচয়' যে ঐতিহ্য তৈরি করেছে, তাকে পরিপূর্ণ বিকাশের পথে অগ্রসর করার জন্য 'পরিচয়' চাইবে একদিকে জনপ্রিয় হতে অন্যদিকে তার বিশেষ প্রগতিশীল ভূমিকাটি পালন করতে। তাই গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বালোচনার সঙ্গেই প্রকাশিত হবে সহজবোধ্য নিবন্ধ। কিন্তু বলাই বাহুল্য 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত কোনো রচনাই তার মূল লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হবে না। সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে 'পরিচয়' যেমন সংগ্রাম করবে, তেমনই সে প্রকাশ করবে যথার্থ শিল্পসৃষ্টির সার্থক নমুনা। পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে বিশ্ব-সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে সৃষ্টি ও সংগ্রাম—এই দ্বৈত ভূমিকা পালনে 'পরিচয়' আরও একবার তার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করছে।

ফাল্গুন থেকে প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : দশ টাকা। ষান্মাষিক গ্রাহক চাঁদা : পাঁচ টাকা পঞ্চাশ ন. প.

পরিচয়

ফাল্গুন ১৩৬৮



পরিচয়

 সূচীপত্র

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।



পরিচয়
বর্ষ ৩১। সংখ্যা ৮
ফাল্গুন। ১৩৬৮

রবীন্দ্রনাথ ও নন্দনতত্ত্ব

নীরেন্দ্রনাথ রায়

'নন্দনতত্ত্ব' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করিয়াছিলেন ১৩৩৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত 'আধুনিক কাব্য' নামক প্রবন্ধে, এবং তখন ইহার দ্যোতনাকে সুস্পষ্ট করার জন্য প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন যে বিদেশীয় শব্দের ইহা প্রতিশব্দ—Aesthetics—তাহাকে বন্ধনীর মধ্যে স্থাপনের। 'নন্দনতত্ত্ব' ও 'এস্থেটিকস' মূলগতভাবে সমার্থক কি না, এই দার্শনিক বিচারের অবকাশ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কাব্য-সাহিত্যের বিচারে যাহাকে বলা যাইতে পারে এস্থেটিক দৃষ্টিভঙ্গী তাহার প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে অতি প্রাচীনকাল হইতেই। কারণ, কাব্য-সাহিত্যের বিচারে বহিরঙ্গ স্তর ভেদ করিয়া গভীরতর স্তরে উপনীত হইলেই এমন সব প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয় যাহাদের বিস্তার সাহিত্যের চেয়ে ব্যাপকতর। যেমন, রস কাহাকে বলে, সৌন্দর্য কাহাকে বলে, ললিতকলা কাহাকে বলে, ইত্যাদি। এই সকল প্রশ্নের সামগ্রিক বিচারের উদ্দেশ্যে ইওরোপে প্রধানত অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দর্শনশাস্ত্রের একটি বিশেষ বিভাগের উদ্ভব হয়, যাহার নাম 'এস্থেটিকস'। চিত্র, সংগীত, নৃত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পকলার-ও বিচার ইহার অন্তর্ভুক্ত। 'নন্দনতত্ত্ব' শব্দটিকে এই বিশিষ্ট অর্থে বোঝাই ছিল রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘজীবনব্যাপী সৃষ্টিশীলতা যে সাহিত্যের গণনাতীত প্রকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, সঙ্গীত, চিত্র ও নৃত্যছন্দ প্রভৃতিতেও যে তাঁহার নবনব অবদান পুঞ্জীভূত হইয়া আছে—ইহা আজ বিশ্ববিদিত। তাঁহার এই পরমবিস্ময়কর বহুমুখিনতা সত্ত্বেও ইহাও অস্বীকার

করা যায় না যাহা তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন তাঁহার জীবনের 'বিদায়কালে'—"একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।" নানাবিধ শিল্পকলার সহিত যে প্রত্যক্ষ পরিচয় রবীন্দ্রনাথের ছিল বিশ্বমানবের ইতিহাসে তাহার তুলনা অতি বিরল। তবুও তাঁহার আলোচনা-ভিত্তিক রচনাসম্ভারের অধ্যয়নে দেখা যায় নন্দনতাত্ত্বিক চরিত্রের প্রবন্ধগুলিতে সাহিত্যিক সমস্যার বিশ্লেষণেই তাঁহার চিত্ত ছিল উন্মুখ ও লেখনী স্বচ্ছন্দগতি। বর্তমান প্রবন্ধে তাই স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্য-বিচারের মাধ্যমে সৌন্দর্যসৃষ্টির সমস্যা প্রাধান্য পাইবে।

নন্দনতত্ত্বের ইতিহাসে ইহা সুস্পষ্ট যে অন্তত প্রাক্-আধুনিক যুগে যাঁহারা তাত্ত্বিক হিসাবে আচার্যস্থানীয়, যেমন ভরত ও আরিস্টোটল, হেগেল ও অভিনবগুপ্ত, শিল্পসৃষ্টির ইতিহাসে তাঁহাদের স্থান নাই। অন্যদিকে মহৎশিল্পী হিসাবে যাঁহাদের আসন বিশ্বপুজ্য, যেমন কালিদাস ও চণ্ডীদাস, দান্তে ও শেক্স্পীয়র, তাঁহাদের শিল্পতাত্ত্বিক মতামত প্রায় অজ্ঞাত, মূলত অনুমানসাপেক্ষ। উভয় ক্ষেত্রে কীর্তিমান ব্যক্তিদের আবির্ভাব দেখা যায় আধুনিক যুগেই। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদেরই অন্যতম। কাব্যে সৌন্দর্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নন্দনতাত্ত্বিক নানা প্রশ্ন তাঁহার চেতনায় নাড়া দিয়াছিল ও তিনি এই সম্পর্কে নানাবিধ অধ্যয়নেও মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে রচিত হয় প্রায় ৬৫ বৎসর আগে, অর্থাৎ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি কবিতা যাহাকে নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের ভূমিকারূপে ব্যবহার করা যায়। কবিতাটির উপাধি 'পূর্ণিমা', ১৩০২ সালের ১৬ই অগ্রহায়ণ, এক পূর্ণিমার রাত্রিতে রচিত, এবং 'চিত্রা'-য় সংকলিত। আশঙ্কা হয়, কবিতাটি 'সঞ্চয়িতা'-র অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তাহার প্রাপ্য প্রসিদ্ধি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তাই সেটিকে এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা গেল।

"পড়িতেছিলাম গ্রন্থ বসিয়া একেলা
সঙ্গীহীন প্রবাসের শূন্য সন্ধ্যাবেলা
করিবারে পরিপূর্ণ। পণ্ডিতের লেখা
সমালোচনার তত্ত্ব; পড়ে হয় শেখা
সৌন্দর্য কাহাকে বলে—আছে কি কি বীজ
কবিত্ব কলায়; শেলি, গেটে, কোলরিজ

কার কোন্ শ্রেণী। পড়ি পড়ি বহুক্ষণ
তাপিয়া উঠিল শির, শ্রান্ত হলো মন,
মনে হলো সব মিথ্যা; কবিত্ব কল্পনা
সৌন্দর্য সুরুচি রস সকলি জল্পনা
লিপি-বণিকের; অন্ধ গ্রন্থকীটগণ
বহু বর্ষ ধরি শুধু করিছে রচন
শব্দ-মরীচিকা জাল, আকাশের পরে
অকর্ম আলস্যাবেশে দুলিবার তরে
দীর্ঘরাত্রিদিন।
অবশেষে শ্রান্তি মানি
তন্দ্রাতুর চোখে, বন্ধ করি গ্রন্থখানি
ঘড়িতে দেখিনু চাহি—দ্বিপ্রহর রাতি,
চমকি আসন ছাড়ি নিবাইনু বাতি।
যেমনি নিবিল আলো, উচ্ছ্বসিত স্রোতে
মুক্তদ্বারে, বাতায়নে, চতুর্দিক হতে
চকিতে পড়িল কক্ষে বক্ষে চক্ষে আসি
ত্রিভুবন বিপ্লাবিনী মৌন সুধা হাসি।
হে সুন্দরী, হে প্রেয়সী, হে পূর্ণ পূর্ণিমা,
অনন্তের অন্তর-শায়িনী। নাহি সীমা
তব রহস্যের। এ কি মিষ্ট পরিহাসে
সংশয়ীর শুষ্কচিত্ত সৌন্দর্য উচ্ছ্বাসে
মুহূর্তে ডুবালে? কখন দুয়ারে এসে
মুখানি বাড়ায়ে, অভিসারিকার বেশে
আছিলে দাঁড়ায়ে, একপ্রান্তে সুররানী,
সুদূর নক্ষত্র হতে সাথে করে আনি
বিশ্বভরা নীরবতা। আমি গৃহকোণে
তর্কজাল বিজড়িত ঘন বাক্যবনে
শুষ্কপত্র পরিকীর্ণ অক্ষরের পথে
একাকী ভ্রমিতেছিনু শূন্য মনোরথে,
তোমারি সন্ধানে। উদ্‌ভ্রান্ত এ ভকতেরে

এতক্ষণ ঘুরাইলে ছলনার ফেরে।
কি জানি কেমন করে লুকায়ে দাঁড়ালে
একটি ক্ষণিক ক্ষুদ্র দীপের আড়ালে
হে বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী। মুগ্ধ কর্ণপুটে
গ্রন্থ হতে গুটিকত বৃথা বাক্য উঠে
আচ্ছন্ন করিয়াছিল কেমনে।না জানি
লোকলোকান্তরপূর্ণ তব মৌন বাণী।"

এই কবিতাটি হইতে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় ইওরোপীয় রোমান্টিক যুগের নন্দনতত্ত্ব কিরূপ আগ্রহের সহিত রবীন্দ্রনাথ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে কবি রবীন্দ্রনাথের মতে প্রত্যক্ষ অনুভূতির অভাবে সমালোচনার তত্ত্ব সর্বৈব বৃথা।

অথচ দেখা যায়, একা রবীন্দ্রনাথ নন, শেলি-গেটে-কোলরিজ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবিরাও বহু অমূল্য সময় অপচয় করিয়াছেন এই পথে। কিন্তু সত্যই কি "অপচয়"? সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে সৃষ্টি ও বিচার কি প্রকৃতই পরস্পরবিরোধী? মূল্যজ্ঞানের, বিচারবোধের অভাবে কি মহৎশিল্পের সৃষ্টি সম্ভব? অপর দিকে, অনুভূতির ব্যাপকতার, ভাবাবেগের গভীরতার অভাবে কি সমালোচনা ব্যক্তিগত মতামতের সংকীর্ণ সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে? তাই মনে হয়, যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি, রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রকৃত কবিতার উৎস, প্রকৃত নন্দনতত্ত্বের উৎসও তাহাই! শিল্পকর্মের সৃষ্টি ও শিল্পতত্ত্বের বিচার—অন্তরের গভীরে প্রোথিত একই মূল হইতে ইহারা উদ্ভূত; পার্থক্য আসে পরে, একই কাণ্ড হইতে বিস্তৃত ভিন্নমুখ বৃহৎ বৃহৎ শাখার মতো।

নন্দনতত্ত্বের একটি প্রধান ধারার মূল বক্তব্য এইরূপ: শিল্পসৃষ্টিতে শিল্পীর প্রধান উদ্দেশ্য আত্মপ্রকাশ। শিল্পী যাহা আপন অন্তরে উপলব্ধি করেন, আপন শিল্পপ্রতিভায় তাহাকে রূপ দিয়া আপনার বাহিরে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই রূপন-কর্মেই তাঁহার চরম আনন্দ, চরম সার্থকতা। রবীন্দ্ররচনার অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই জানেন, এইরূপ মতের সমর্থনে নানা উক্তি তাঁহার সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর যত্রতত্র ছড়ানো আছে। কেবল প্রয়োজনের তাগিদে এখানে তাদের কয়েকটি উদ্ধৃত হইতেছে।

"আমি আছি এক, বাইরে আছে বহু। এই বহু আমার চেতনাকে

বিচিত্র করে তুলছে, আপনাকে নানা কিছুর মধ্যে জানছি নানা ভাবে। এই বৈচিত্র্যের দ্বারা আমার আত্মবোধ সর্বদা উৎসুক হয়ে থাকে। বাইরের অবস্থা একঘেয়ে হলে মানুষকে মন-মরা করে।

শাস্ত্রে আছে, এক বললেন, বহু হব, নানার মধ্যে এক আপন ঐক্য উপলব্ধি করতে চাইলেন। একেই বলে সৃষ্টি। আমাতে যে এক আছে সেও নিজেকে বহুর মধ্যে পেতে চায়, উপলব্ধির ঐশ্বর্য তার সেই বহুলত্বে। আমাদের চৈতন্যে নিরন্তর প্রবাহিত হচ্চে বহুর ধারা, রূপে রসে নানা ঘটনার তরঙ্গে; তারি প্রতিঘাতে স্পষ্ট করে তুলছে 'আমি আছি'—এই বোধ। আপনার কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পষ্টতাতেই আনন্দ। অস্পষ্টতাতেই অবসাদ।

বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়। তার যে রস সে অহৈতুক। মানুষ সেই দায়মুক্ত বৃহৎ আকাশের ক্ষেত্রে কল্পনার সোনার কাঠি-ছোঁয়া সামগ্রীকে জাগ্রত করে জানে আপনারই সত্তায়। তাই সেই অনুভবে অর্থাৎ আপনারই বিশেষ উপলব্ধিতে তার আনন্দ। এই আনন্দ-দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে জানি নে।" [সাহিত্যতত্ত্ব, প্রবাসী, ১৩৪১ বৈশাখ]

নন্দনতত্ত্বের 'এই বিশেষ ধারার সাহিত্যক্ষেত্রে প্রয়োগে ও বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন অপূর্ব দক্ষতা। রূপনার প্রতিভা, "রূপদক্ষ"[১] হইবার নৈপুণ্য, অতি অল্প লোকেরই করায়ত্ত। ইহার প্রকৃতি রহস্যাবৃত। ইচ্ছাশক্তি দিয়া, অধ্যবসায় দিয়া ইহাকে অর্জন করা যায় না। এই রহস্যলোকে রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন অজস্র আলোকপাত নানা উপমায় নানা উদাহরণে, যাহাতে তাঁহার সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলি হইয়া উঠিয়াছে উপাদেয়, নূতন একজাতীয় সাহিত্যসৃষ্টির মতো। এই প্রসঙ্গে সহজেই মনে পড়ে 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'-র কথা। বিচারবুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, সংলাপের নাটকীয়তায় ও সরস প্রকাশভঙ্গির ঔজ্জ্বল্যে এ গ্রন্থটি কেবল রবীন্দ্র-সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও, আমার বিশ্বাস, অতুলনীয়।

কিন্তু এ কথা কিছুতেই ভোলা চলে না যে নন্দনতত্ত্বের বা সাহিত্য-

১। "এই "রূপদক্ষ" কথাটি আমার নূতন পাওয়া। Inscription অর্থাৎ একটা প্রাচীন লিপিতে পাওয়া গেছে, আর্টিস্টের একটা চমৎকার প্রতিশব্দ।"—রবীন্দ্রনাথ

বিচারের মূল উদ্দেশ্য নূতনতর সাহিত্যসৃষ্টি নয়। নন্দনতত্ত্ব শেষ বিচারে দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্গত, তাহার বিশিষ্ট অঙ্গ। নন্দনতত্ত্বের যে ধারাটি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মতামতে প্রতিফলিত তাহা মূলত ভাববাদী, তাহা সমাজ ও ইতিহাস নিরপেক্ষ, সুতরাং অবৈজ্ঞানিক। মনে রাখিতে হইবে, সাহিত্যে বা শিল্পে সৃজনীপ্রতিভা যুক্তি বা বিজ্ঞান দিয়া অর্জন করা না গেলেও সাহিত্যের ও শিল্পের বিচার, অর্থাৎ নন্দনতত্ত্ব তত্ত্বহিসাবে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে, যুক্তিমার্গকে, উপেক্ষা করিতে পারে না। সাহিত্য-বৃত্তিকে অহৈতুক, সাহিত্যের উৎকর্ষকে অনির্বচনীয় ও তাহার আনন্দকে ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর বলিলে নন্দনতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি শিথিল হইয়া যায়।

এই ভাববাদী দার্শনিক ভিত্তির অন্যান্য গুরুতর অসম্পূর্ণতাও আছে। কোনো লেখকের আত্মার প্রকাশ কেন ও কিভাবে অগণিত বিভিন্ন পাঠকের আত্মাকে সংক্রমিত বা অভিভূত করিতে পারে, একই লেখকের মূল্যায়ণ কেনই বা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকারের হয়, ও এই ধরনের নানা প্রশ্নের হদিস বিশুদ্ধ ভাববাদের পাদপীঠ হইতে পাওয়া যায় কি না তাহা গভীর বিচারসাপেক্ষ। ইহাও আমাদের অভিজ্ঞতা যে সব শিল্পকর্মের আনন্দ-মূল্য এক স্তরের নয়। কবিমাত্রেই নন কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথ। কেবল শিল্পচাতুর্য বা আঙ্গিক-কুশলতা দিয়াও বিচার সম্পূর্ণ হয় না। তাহা হইলে হয়তো ভারবি কি মাঘকে বসাইতে হয় কালিদাসের চেয়ে উচ্চতর স্থানে, শেলির চেয়ে সুইনবার্ণকে। এ ধরনের প্রশ্ন যে রবীন্দ্রনাথের মনেও দেখা দিয়াছিল তাহা জানিতে পারা যায় তাঁহার 'সাহিত্যে নবত্ব', 'আধুনিক কাব্য' প্রভৃতি নানা প্রবন্ধে। পাওয়া যে যায় তার একমাত্র কারণ এই যে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণত ভাববাদী, সমাজ ও ইতিহাস নিরপেক্ষ, বিজ্ঞানবিমুখ ছিলেন না। তাঁহার জীবনের সুবিপুল কর্মকাণ্ডের কথা বাদ দিয়াও তাঁহার সাহিত্যিক প্রবন্ধাবলীতেও ইহার নিদর্শন না থাকিয়া পারে নাই। আবার কয়েকটি উদ্ধৃতি নেওয়া যাক।

> ক। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না, আমরা জ্ঞানত কি অজ্ঞানত মানুষকেই সবচেয়ে বেশি গৌরব দিয়ে থাকি? আমরা যদি কোনো সাহিত্যে অনেকগুলো ভ্রান্তমতের সঙ্গে একটি জীবন্ত মানুষ পাই সেটাকে কি চিরস্থায়ী করে রেখে দিই নে? জ্ঞান পুরাতন ও অনাদৃত হয় কিন্তু মানুষ চিরকাল সম্প্রদান করতে পারে। সত্যকার

> মানুষ প্রতিদিন যাচ্ছে এবং আসছে, তাকে আমরা খণ্ড খণ্ড করে দেখি, এবং ভুলে যাই, এবং হারাই। অথচ মানুষকে আয়ত্ত করার জন্যেই আমাদের জীবনের সর্বপ্রধান ব্যাকুলতা। সাহিত্যে সেই চঞ্চল মানুষ আপনাকে ধরে রাখে; তার সঙ্গে আপনার নিগূঢ় যোগ চিরকাল অনুভব করতে পারি।
>
> খ। প্রত্যেক মানুষের পক্ষে মানুষ হওয়া প্রথম দরকার। অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের যে লক্ষ লক্ষ সম্পর্কসূত্র আছে, যার দ্বারা প্রতি নিয়ত আমরা শিকড়ের মতো বিচিত্র রসাকর্ষণ করছি, সেইগুলোর জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তোলা, তার নূতন নূতন ক্ষমতা আবিষ্কার করা, চিরস্থায়ী মনুষ্যত্বের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগসাধন করে ক্ষুদ্র মানুষকে বৃহৎ করে তোলা—সাহিত্য এমনি করে আমাদের মানুষ করছে। সাহিত্যের শিক্ষাতেই আমরা আপনাকে মানুষের ও মানুষকে আপনার, বলে অনুভব করছি।
>
> গ। প্রকাশটাই হচ্ছে সাহিত্যের প্রথম সত্য। কিন্তু ঐটেই কি শেষ সত্য?
>
> সাহিত্যের আদিম সত্য হচ্ছে প্রকাশমাত্র, কিন্তু তার পরিণাম সত্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়, মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মানুষকে প্রকাশ। আমরা কেবল দেখিনে প্রকাশ পেলে কি না, দেখি, কতখানি প্রকাশ পেলে। দেখি, যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তাতে কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, না, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির তৃপ্তি হয়, না, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং হৃদয়ের তৃপ্তি হয়। সেই অনুসারে আমরা বলি অমুক লেখায় বেশি অথবা অল্প সত্য আছে। কিন্তু এটা স্বীকার্য যে, প্রকাশ হওয়াটা সাহিত্যমাত্রেরই প্রথম ও প্রধান আবশ্যক। বরঞ্চ ভাবের গৌরব না থাকলেও সাহিত্য হয়, কিন্তু প্রকাশ না পেলে সাহিত্য হয় না। বরঞ্চ মুড়ো গাছও গাছ, কিন্তু বীজকে গাছ বলা যায় না।

যে নিবন্ধমালা হইতে এই উদ্ধৃতিগুলি গৃহীত তাহার বিশেষত্ব সম্বন্ধে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। ইহারা রচিত হয় নাই সাধারণের সমক্ষে মুদ্রিত প্রকাশের প্রচলিত তাগিদে, রচিত হইয়াছিল কবিবন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সহিত পত্রযোগে সাহিত্যবিষয়ে আলোচনার জন্য। রবীন্দ্রনাথ লোকেন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, "লেখা সম্বন্ধে তুমি যে

প্রস্তাব করেছ সে অতি উত্তম। মাসিকপত্রে লেখা অপেক্ষা বন্ধুকে পত্রলেখা অনেক সহজ।" পরে উভয়েরই পত্রাবলী নিবন্ধাকারে প্রকাশিত হয় 'সাধনা' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায়। এই যৌথ প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের অংশ 'পত্রালাপ' নামে প্রথমে 'সাহিত্যের পথে' সংকলনের প্রথম সংস্করণে ও অধুনা 'সাহিত্য' সংকলনের নবতম সংস্করণে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু লোকেন্দ্রনাথের অংশ বর্তমানে লোকচক্ষুর প্রায় অগোচর। গ্রন্থপরিচয়ে বিশ্বভারতী প্রকাশনের সম্পাদক কেবল এইটুকু বলিয়াই দায়মুক্ত হইয়াছেন : "কৌতূহলী পাঠক সাধনায় লোকেন্দ্রনাথের পত্রপ্রবন্ধগুলিও পাইবেন ; 'সাহিত্যের সত্য', 'সাহিত্যের উপাদান' এবং 'সাহিত্যের নিত্যলক্ষণ' শিরোনামে ১২৯৮ চৈত্র, ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ এবং ১২৯৯ শ্রাবণ সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল।" আপন রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের সম্পাদনায় আপন ঘনিষ্ঠতম সাহিত্যিক বন্ধুর প্রতি এই অবহেলায় রবীন্দ্রনাথ যে কি পরিমাণে বেদনার্ত হইতেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। একটি বিশেষ যুগের রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকীর্তির বিকশনে লোকেন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল তুলনাতীত। 'পত্রালাপ'-এর পর্বে, ১৮৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দে লোকেন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের পুরোভাগে। কেবল ইংরেজি সাহিত্য নয়, সমগ্র ইওরোপীয় সাহিত্যে তাঁহার ছিল প্রত্যক্ষ ও প্রগাঢ় অধিকার। তিনিই ছিলেন তখনকার যুগে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অনুরাগী ও শ্রেষ্ঠ সমালোচক। তাঁহার সাহিত্যিক মতামতকে রবীন্দ্রনাথ কতদূর শ্রদ্ধা করিতেন তাহার অবিস্মরণীয় নিদর্শন থাকিয়া গিয়াছে বিশ্ববিখ্যাত 'উর্বশী' কবিতার প্রকাশনে। এখন সকলেই জানেন এই কবিতাটি আটটি স্তবকে সম্পূর্ণ। অথচ বহু বৎসর ধরিয়া কবিতাটি মুদ্রিত হইত ছয়টি স্তবকে, শেষ দুইটি স্তবক বাদ দিয়া। একমাত্র লোকেন্দ্রনাথের অভিমত-অনুসারে রবীন্দ্রনাথ নিজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতাকে এইভাবে ছিন্ন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের কোনো এক সংখ্যা 'পরিচয়'-এ 'কবিতায় বক্তব্য' নামক প্রবন্ধে আমি এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলাম। এখানে তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। এখন আমার বক্তব্য কেবল এইটুকু যে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বাঙালীর মধ্যে লোকেন্দ্রনাথের চেয়ে বেশি আর কেহ যদি বিশ্বকবির সাহিত্যিক চেতনাকে প্রভাবিত করিয়া থাকেন, তাহা আমার অজ্ঞাত। দুঃখের বিষয় লোকেন্দ্রনাথের নিজস্ব রচনার

প্রায় কিছুই বাঙালী পাঠকের কাছে উপস্থিত নাই। রবীন্দ্র-প্রতিভার সৌর-জগতে লোকেন্দ্রনাথের প্রভাব যেন একটা লুপ্তগ্রহের অস্তিত্বের মতো। তাঁহাকে বাদ দিয়া রবীন্দ্রকাব্যের বিবর্তনের বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ হইতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথেরই রচনা হইতে ভিন্ন প্রকৃতির দুই ধরনের উদ্ধৃতিমালা দিয়া, আশা করা যায়, দেখানো গিয়াছে যে নন্দনতত্ত্বের মৌলিক প্রশ্নাবলীর বিচারে তাঁহার মানসলোকে ছিল স্বতোবিরোধিতা বা দ্বৈতভাব। এই দ্বৈতভাবের উপস্থিতি, দেখা যায়, কোনো কোনো বিজ্ঞ ও রসজ্ঞ রবীন্দ্র-সমালোচককে বিব্রত করিয়াছে। বর্তমান বৎসরে শারদীয় বিশেষ সংখ্যার 'স্বাধীনতা'-য়, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'শিল্পবোধে গান্ধী টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক মনোজ্ঞ প্রবন্ধে লিখিতেছেন :

> "শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পীর ব্যক্তিজীবন যে বৃহৎ সমাজজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং এই কারণেই শিল্পকর্মও যে সামাজিক অন্যান্য সকলপ্রকার কর্মের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত রবীন্দ্রনাথ এই কথাটা সব সময় স্বীকার করিতে চাহেন নাই, বরঞ্চ তাঁহার ভিতরে এই কথাটা অস্বীকার করার প্রবণতাই দেখা দিয়াছে অধিক সময়ে। সময়ে সময়ে রবীন্দ্রনাথকে খুব জোর করিয়াই এই কথা আমরা বলিতে দেখিয়াছি যে শিল্প-প্রতিভা সকল সমাজ ও ইতিহাস বিবর্তন নিরপেক্ষ শিল্পীর সম্পূর্ণ নিজস্ব ধর্ম। × × × কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টিকে সমগ্রভাবে বিচার করিলে ইহাই রবীন্দ্রনাথের শিল্পবোধের শেষ কথা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। (অথচ) গানে কবিতায় আলোচনায় এ-জাতীয় কথা অস্বীকার করিতে পারিতেছি না।"

এই বিরোধিতার সমাধানকল্পে দাশগুপ্ত মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে যে প্রণালীর প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা নন্দনতত্ত্ব-বিচারে হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির অনুরূপ। এই পদ্ধতিতে দেখানো হয় যে কোনো বৃহৎ আইডিয়া চিরন্তন স্থিতিশীল নয়, তাহারই অস্তিত্বের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট হয় তাহার বিপরীত আইডিয়া। সুতরাং আইডিয়ার জগতে প্রগতির জন্য বস্তুজগতের বা সমাজজীবনের প্রভাব গৌণ। আজ ইহা সকলেরই সুবিদিত, এই আকাশচারী হেগেলীয় দ্বান্দ্বিককে মার্কস ও এঙ্গেলস কিভাবে মাটিতে নামাইয়া আনিয়া স্থাপিত করেন বৈজ্ঞানিক বনিয়াদের উপর। রবীন্দ্রনাথের মানসলোকে অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকৃত চরিত্র বুঝিতে গেলে আমাদেরও প্রয়োজন আছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রয়োগের,

এবং এই প্রচেষ্টায় আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক হইতে পারে লেনিনের প্রবন্ধাবলী, তলস্তোই-এর বিচারে।

লেনিনের সূত্রানুযায়ী রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিচারে সংক্ষেপে ইহাই বলা যায় যে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁহার ব্যক্তিগত বা স্বেচ্ছানির্দিষ্ট ব্যাপার নয়। বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের যে যুগে রবীন্দ্র-প্রতিভা সৃষ্টিশীল সে যুগের বাঙালীসমাজের অভ্যন্তরে ছিল ক্রমবর্ধমান স্বতোবিরোধিতা। এই স্বতোবিরোধিতার অপূর্ব শিল্পসম্মত ভাস্বর প্রতিফলন হইতেছে সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য। সমাজের দৈনন্দিন জীবনে যেমন একই কালে প্রচলিত ছিল গরুর গাড়ির ও রেলের গাড়ির ব্যবহার, রবীন্দ্রমানসেও তেমনই একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল ছিল সনাতন উপনিষদের প্রতি আনুগত্য ও আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ। রেলের গাড়ির তুলনায় গরুর গাড়ির প্রচলন ব্যাপকতর হইলেও রেলের গাড়ির প্রভাবই ছিল ভবিষ্যতের অভিমুখে। উপনিষদের বিশ্ববীক্ষাও তেমনই রবীন্দ্রমানসে ব্যাপকতর হওয়া সত্ত্বেও ইওরোপ হইতে আগত বুর্জোয়া বিশ্ববীক্ষাকে আত্মস্থ করিতে পারাই রবীন্দ্রপ্রতিভার তর্কাতীত গৌরব। এই দুই বিভিন্ন কালধর্মী বিশ্ববীক্ষাকে সমীকরণের প্রচেষ্টা সহজে সাধিত হয় নাই। নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নানা আকর্ষণ-বিকর্ষণের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে সমগ্র মানব-সমাজের পূর্ণ কল্যাণের লক্ষ্যপথে। মনে রাখিতে হইবে, যে বুর্জোয়া বিশ্ববীক্ষা ভারতে আসিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুসরণে তাহার ভিতরেও ছিল প্রকাণ্ড বিরোধিতা। তাহার একদিক ছিল ভারতের সনাতন সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধ্বংসশীল, অন্যদিক ভবিষ্যতের স্বাধীন জাতিগঠনের অভীপ্সার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টিশীল। কেবল ইহাই নহে। মানব-ইতিহাসের সামগ্রিক বিচারে ফিউডালবাদী সমাজ-ব্যবস্থার তুলনায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা উন্নততর পদক্ষেপ হইলেও, ইহার মানবিক অগ্রগতির অনিবার্য শর্ত ছিল শ্রেণী-স্বার্থের ঘনিমা, শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠাতেই হইতে পারে যাহার একমাত্র পরিণাম। এই পরিণামের স্বপ্ন ও ইহার জন্য সংগ্রামকে বলা যায় বুর্জোয়া বিশ্ববীক্ষার মহত্তম অংশ। ঔপনিষদিক বিশ্ববীক্ষা ও আধুনিক বুর্জোয়া বিশ্ববীক্ষা একই পর্যায়ের না হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের সচেতন সংবেদনশীল মানসলোকে ইহাদের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত না হওয়াই হইত অস্বাভাবিক, অনৈতিহাসিক। এই দ্বন্দ্বকে ভারতীয়

আদর্শের সহিত ইওরোপীয় আদর্শের দ্বন্দ্ব বা প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের দ্বন্দ্ব, এইভাবে দেখিলে, মনে হয়, ঠিকভাবে দেখা হইবে না। সম্প্রতি যে তর্ক উঠিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের কাব্য-অনুপ্রেরণা কতখানি ভারতীয় ও কতখানি পশ্চিমী, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পাদপীঠ হইতে তাহাকে মনে হয় অবাস্তব, ভিত্তিহীন। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠদান যেমন সমগ্রভাবে মানবীয়, ইওরোপের বুর্জোয়া সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠদানও সেইরূপ সমগ্রভাবে মানবীয়। ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির যে যুগোপযোগী মানবিক আবেদন ছিল তাহা বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ইওরোপীয় রেনেসাঁসের মানবিকতাও সেইরূপ বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরেজ শাসনের সূত্র ধরিয়া ভারতে বুর্জোয়া অর্থনীতি অনুপ্রবেশ করিলে ভারতীয় সমাজ বিশ্ববুর্জোয়াসমাজের অঙ্গীভূত হইল। বহু শতাব্দীব্যাপী ফিউডাল ভাবধারার মর্মে গিয়া আঘাত করিল নবাগত বুর্জোয়া মূল্যবোধ, ও তাহার ফলে সৃষ্ট হইল বিশ্বমানবিকতার একটি বিশিষ্ট রূপ। বিদেশাগত আপেল ফলের চাষ ভারতের ভূমিতে ফলাইল ভারতীয় আপেল—যাহা জীনাস হিসাবে বিদেশীয় হইলেও স্পীশিজ হিসাবে ভারতীয়। স্মরণ করা যাক রবীন্দ্রনাথের উক্তি: "হোমরের মহাকাব্যের কাহিনীটা গ্রীক, কিন্তু তার মধ্যে কাব্য-রচনার যে আদর্শটা আছে যেহেতু তা সার্বভৌমিক এইজন্যেই সাহিত্যপ্রিয় বাঙালীও সেই গ্রীক কাব্য পড়ে তার রস পায়। আপেল ফল আমাদের দেশের অনেক লোকের পক্ষেই অপরিচিত, ওটা সর্বাংশেই বিদেশী—কিন্তু ওর মধ্যে যে ফলত্ব আছে সেটাকে আমাদের অত্যন্ত স্বাদেশিক রসনাও মুহূর্তের মধ্যে সাদরে স্বীকার করে নিতে বাধা পায় না।" এখানে এই মন্তব্যের প্রয়োজন আছে যে রবীন্দ্রনাথের রসনা স্বাদেশিক হওয়া সত্ত্বেও কালোপযোগী শিক্ষায় ছিল মানবিক, তাই আপেলের স্বাদকে মুহূর্তের মধ্যে সাদরে স্বীকার করিয়া লইতে তাহা বাধা পায় নাই। কিন্তু যে সকল ভারতীয় পণ্ডিত একান্তভাবে ভারতীয়, কালোপযোগী শিক্ষায় বঞ্চিত, তাঁহাদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য খাটে না। ভারতীয় হইয়াও ভারতে-জাত আপেল ফলকে তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিতে পারেন কি না, ভারতীয় পূজা-আচারে এই উপভোগ্য ফলটির এখনও কোনো শাস্ত্রসম্মত স্থান আছে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও জিজ্ঞাসা করা যায়, উপনিষদের বাণীর যে ধরনের ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ প্রচার করিতেন তাহাকে কি বলা যায় সনাতন? বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীহেমন্ত

গঙ্গোপাধ্যায় বিগত শারদীয় সংখ্যা 'আন্তর্জাতিক' পত্রে 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব' নামক প্রবন্ধে বলিতেছেন: "একথা ধ্রুবসত্য যে রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে উপনিষদের মন্ত্রগুলি ব্যবহার করেছেন তা আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণার সহিত মেলে না। 'মানব সত্য' প্রবন্ধটি যদি "মানুষের ধর্মের" সারাংশ হয়ে থাকে, তবে এই সত্য কোনো অলৌকিক পারলৌকিক মুক্তির বাণী নয়, ইহলোকের মহামানবের পরম সৌভ্রাত্র ও শান্তির বাণী।" সনাতন বিশ্ববীক্ষার সহিত রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষার এইখানেই পার্থক্য!

এই পার্থক্যের আর একটি মনোজ্ঞ নিদর্শন আছে রবীন্দ্রনাথের এক কবিতায়। ভারতীয় কাব্যের ক্ষেত্রে কালিদাসই রবীন্দ্রনাথের গুরু, ভার্জিল যেমন ছিলেন দান্তের, ইহা সঙ্গতভাবেই বলা যায়। যে নবরত্নের মালে কালিদাস ছিলেন প্রথম রত্ন, সে যুগে জন্ম হইলে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রস্তুত ছিলেন সে শ্রেণীতে হইতে দশমরত্ন অর্থাৎ 'লাস্ট বয়'। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার জন্ম হইল কয়েক শত বছর পরে বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনীতে নয়, ইংরেজের রাজধানী কলিকাতায়। তাই তিনি পরিহাস ছলে হইলেও বলিতে পারিলেন এই সত্যকথাটি যে "কালিদাসকে হারিয়ে দিয়ে গর্বে বেড়াই নেচে।" এ গর্বের কারণ এই নয় যে রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন যে কবি হিসাবে তাঁহার প্রতিভা কালিদাসের কবিপ্রতিভা হইতে উচ্চতর, কারণটি এই যে তিনি জানিতেন যে তাঁহার যুগ কালিদাসের যুগের চেয়ে উন্নততর। "তাঁহার কালের স্বাদ-গন্ধ আমি তো পাই মৃদুমন্দ, আমার কালের কণামাত্র পান নি মহাকবি।" রবীন্দ্রনাথের আনন্দের প্রকৃত কারণ এই যে তিনি উত্তরাধিকারী নন কেবলমাত্র ভারতের কালিদাসের, তিনি উত্তরাধিকারী বুর্জোয়া জগতের শ্রেষ্ঠ মানবিক কবিদের।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতীতিতে ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের প্রভাব ছিল অসামান্য, ইহা সকলেরই জানা কথা। প্রত্যেক মনোযোগী বাঙালী পাঠক জানেন, কীটস্-এর "Beauty is truth, truth beauty", এই বিতর্কমূলক উক্তিটিকে আলোচনা রবীন্দ্রনাথ কতবার কতরকমে করিয়াছেন। উক্তিটি যতই বিখ্যাত হোক, ইহার সঠিক অর্থনির্ণয় তত সুসাধ্য নয়। ইংলণ্ডের পণ্ডিতসমাজ এখনও এ বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌছাইয়াছেন কি না আমার জানা নাই। অথচ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশীয় সাহিত্য-সমালোচক

চেনিশেভস্কি হেগেলের ভাববাদী দ্বান্দ্বিক দর্শনের প্রতিবাদে মানবজীবনে সত্যের সহিত সুন্দরের যে ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন তাহাতেই যেন কীটস্-এর উক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

"Beautiful is that being in which we see life as it should be, according to our conception; beautiful is the object which expresses life, or reminds us of life. By real life we mean not only man's relations to the objects and beings of the objective world, but also his inner life. Sometimes a man lives in a dream, in that case the dream has for him the significance of something objective."

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবিত্ব' নামক প্রবন্ধে চেনিশেভস্কি-র এই ব্যাখ্যা আমি যখন উদ্ধৃত করি তখন আমার জানা ছিল না যে ইহার প্রায় অনুরূপ উক্তি রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও আছে। অথচ ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ চেনিশেভস্কি-র রচনার সহিত পরিচিত ছিলেন না। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের উনবিংশ অধিবেশনের উপলক্ষ্যে যে অভিভাষণ রবীন্দ্রনাথ লেখেন, তাহা পরে 'পঞ্চাশোর্ধ্বম্' নামে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। তাহাতে আছে:

"যেটাকে মানুষ পেয়েছে সাহিত্য তাকেই যে প্রতিবিম্বিত করে, তা নয়; যা তার অনুপলব্ধ, তার সাধনার ধন, সাহিত্যে প্রধানত তারই জন্য কামনা উজ্জ্বল হয়ে ব্যক্ত হতে থাকে। বাহিরের কর্মে যে প্রত্যাশা সম্পূর্ণ আকার লাভ করে নি, সাহিত্যের কলারচনায় তারই পরিপূর্ণতার কল্পরূপ নানা ভাবে দেখা দেয়।"

সাহিত্যের ছাত্রমাত্রেরই জানা কথা, অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্ন-সুষমাকে জীবনের সত্যে রূপায়িত করার প্রেরণা শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ। বিশেষ করিয়া পরাধীন দেশে জন্মিলে স্বদেশের ও স্বজাতির গ্লানি ও লাঞ্ছনা প্রকৃত কবির চেতনাকে বর্তমানের অভিশাপ হইতে ভাবষ্যতের সার্থকতার সুনিশ্চিত প্রত্যয়ে প্রাণময় করিয়া তোলে। স্বদেশের মুক্তির আকূতির সঙ্গে সর্বমানবীয় মুক্তির আহ্বান একাঙ্গ হইয়া যায়। কবির কবিতা

তখন কেবল আর আত্মপ্রকাশের আনন্দে তৃপ্তি পায় না, তাহা হইয়া ওঠে শক্তিমান প্রহরণ—অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসুন্দরের বিরুদ্ধে। তাই বলা যায়, ১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথের সহিত ইয়েটস-এর প্রথম সাক্ষাৎ হইতে যে নিবিড় আত্মিকতার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহা কোনোক্রমেই ছিল না আকস্মিক। ভারত ও আয়র্লণ্ড, দুই দেশই তখন ইংলণ্ডের শাসনাধীন। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে আইরিশ উদাহরণের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। তাই তখনকার পরাধীন আয়র্লণ্ডের জাতীয় কবি ইয়েটস পরাধীন ভারতের জাতীয় কবির অন্তরের বাণী আপন অন্তর দিয়া বুঝিতে পারিলেন। সত্যের সহিত সুন্দরের বিরোধ কি নিবিড়ভাবে ইয়েটস-এর অন্তরকে মথিত করিত তাহা দেখা যায় হ্রস্ব একটি লিরিকে, 'The Wind Among the Reeds' হইতে গৃহীত।

"All things uncomely and broken, all things worn out
and old,
The cry of a child by the roadway, the creak of a lumbering
cart,
The heavy steps of the ploughman, splashing the wintry
mould,
Are wronging your image that blossoms a rose in the deeps
of my heart.
The wrong of unshapely things is a wrong too great to be
told ;
I hunger to build them anew and sit on a gree know apart,
With the earth and the sky and the water, remade, like a
casket of gold
For my dreams of your image that blossoms a rose in
the deeps of my heart."

চিরকালের সৌন্দর্যের প্রতীক গোলাপকে অবলম্বন করিয়া ইয়েটস-এর এই সংগ্রামী কবিতা কি মনে পড়াইয়া দেয় না চিরকালের মঙ্গলের প্রতীক শঙ্খকে অবলম্বন কারয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা, 'বলাকা' হইতে গৃহীত।

"চলেছিলেম পূজার ঘরে
সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারাদিনের পরে
কোথায় শান্তিস্বর্গ।
এবার আমার হৃদয়ক্ষত
ভেবেছিলেম হবে গত,
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত
হব নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধূলায় নত
তোমার মহাশঙ্খ।

... ...

জানি জানি, তন্দ্রা মম
রইবে না আর চক্ষে
জানি শ্রাবণ-ধারা-সম
বাণ বাজিবে বক্ষে।
কেউবা ছুটে আসবে পাশে,
কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁদবে ত্রাসে
সুপ্তির পর্যঙ্ক
বাজবে যে আজ মহোল্লাসে
তোমার মহাশঙ্খ।
তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অটল রব,

বক্ষে আমার দুঃখে তব
বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব
অভয় তব শঙ্খ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক প্রাক্কালে রচিত এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্বাগত আহ্বান জানাইয়াছেন এক নূতন বিশ্বযুগকে, বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পূর্বেই ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবে যাহার ঐতিহাসিক সূচনা। বিশ্বব্যাপী ধনবাদের অন্তিম পরিণতি যে বিশ্বব্যাপী সমাজবাদে, বুর্জোয়া সংস্কৃতির মানবিকতা যে সমৃদ্ধতর ও পূর্ণতর হইবে সমাজবাদী মানবিকতায় তাহা তখন স্পষ্ট বোধগম্য না হইলেও এখন দিনের পর দিন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই সুমহান পরিণামের পথে এখনও আছে বহুকালব্যাপী সংগ্রাম ও সংঘর্ষ। এই বিঘ্ন-রুক্ষ পথে চলিতে গিয়া মানবজাতি যেন অসময়ে অবসন্ন না হইয়া পড়ে, যেন ইয়েটস-এর গোলাপের স্বপ্নকে ও রবীন্দ্রনাথের শঙ্খের আহ্বানকে বিস্মৃত না হয়, আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বের ইহাই হইল শেষ শিক্ষা।

রবীন্দ্র-শান্তি-মেলার আলোচনা-পর্যায়ের ১০ই নভেম্বরের অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণের অনুসরণে লিখিত—লেখক।

রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার ঐতিহ্য

গোপাল হালদার

কথাটা শেক্স্পীয়রের সম্বন্ধেই বলা হয় "myriad minded." রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও তা কম সত্য নয়। তিনি সহস্রমনাঃ, myriad minded. রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আর-একটি কথাও সেরূপ সত্য, তিনি অখণ্ডমনাঃ। সকলরূপকে নিজ নিজ রূপে দেখা তাঁর কারয়িত্রী প্রতিভার ধর্ম। সকলরূপকে তেমনি সমগ্রভাবে দেখাও তাঁর ভাবয়িত্রী প্রতিভার নিয়ম। সহস্রমনাঃ রবীন্দ্রনাথ তাই অখণ্ডমনাঃ রবীন্দ্রনাথও। সেই বিচিত্রকে যেই ঐক্যের দৃষ্টিতে তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছেন তাকে নানা নামেই চিহ্নিত করা যায়। তবে "মানুষের ধর্মের" কবির সেই জীবনদর্শনকে মানবতা বলাই শ্রেয়ঃ। অবশ্য একটু বিশেষ অর্থের মানবতা কারণ, "তিনি ভূমা।" "কিন্তু মানবিক ভূমা।" কথাটায় কোনো অস্পষ্টতা তিনি রাখেন নি—"আমার বুদ্ধি মানব বুদ্ধি, আমার হৃদয় মানব হৃদয়, আমার কল্পনা মানব কল্পনা।" এই মানবতা যেমন সমস্তকে অতিক্রম করে প্রকাশিত, তেমনি সমস্তকে অধিকার করেও প্রকাশিত।

গোড়ায় এই কথাটা মনে রেখেই আমরা রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশিষ্ট পরিচয় গ্রহণ করতে চাই। যা তাঁর খণ্ডকাল ও দেশকে অতিক্রম করে যায় তা কতটা তাঁর খণ্ডকাল ও দেশকেও অধিকার করে আছে, তা না জানলে রবীন্দ্রপ্রতিভাকে সম্পূর্ণ জানা হয় না।

রবীন্দ্রনাথ "মানব-সত্য" উপলব্ধি করে মানুষের তিনটি জন্মভূমি স্বীকার করেছেন; "সমস্ত জাতির পৃথিবী", "সমস্ত মানুষের স্মৃতিলোক", "সর্বমানবচিত্তের মহাদেশ"। কবির মতে সকল মানুষেরই তাতে জন্মাধিকার। কিন্তু আমরা জানি এই পরমজন্মভূমি জন্মসূত্রে লাভ হয় না, জীবন সূত্রে তা অর্জন করতে হয়। এবং জন্মসূত্রে মানুষ একটি বিশেষ পরিবেশেরই বিশেষ স্থান, কাল ও চেতনার উত্তরাধিকার-ই লাভ করে। রবীন্দ্রনাথও একটি বিশেষ ভূখণ্ডে, একটি বিশেষ কালে এবং বিশেষ এক চেতনার উন্মেষ মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রপ্রতিভা এই বাঙালী পরিবেশকে অধিকার করেই

বিকশিত হয়েছে, সেখানে প্রতিষ্ঠিত থেকেই মানব-সত্যে সমুত্তীর্ণ হয়েছে, ভূমি থেকে পৌছেচে ভূমায়। শুধু তাই নয়। প্রতিভা যেহেতু নব নবোন্মেষ-শালিনী, তাই রবীন্দ্রপ্রতিভা সেই জন্ম ক্ষেত্রকেও নতুন উন্মেষের মধ্যে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে, তাকে দিয়েছে নতুন ঐতিহ্য, মানবতার নতুন অধিকার।

রবীন্দ্র পটভূমি

নিজের জীবনের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেও তার পটভূমিকা নির্দেশ করে গিয়েছেন। তিনটি প্রবল প্রয়াসের মধ্যে তাঁর বাল্য ও যৌবন উদ্‌যাপিত। একটি রামমোহনের সংস্কার আন্দোলন, দ্বিতীয়টি বঙ্কিম পরিচালিত সাহিত্যিক আয়োজন আর তৃতীয়টি জাতীয় আন্দোলন—যা, রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায়, আসলে জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার বহুমুখী উদ্যোগ। সমগ্রভাবে এই তিন প্রয়াসকে আমরা সচরাচর একটি কথাতেই ব্যক্ত করে থাকি—বাঙলার তথা ভারতের রেনেসাঁস বা জাগরণ। এ জাগরণের কেন্দ্র তখন বাঙলা দেশ। তার প্রকাশ দেখা দেয় জাতীয় জীবনের তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে—প্রথম সংস্কার আন্দোলনে, তারপর সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশে, আর শেষে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রাণময় উদ্বোধনে। তিনটির সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানে-কর্মে-ভাবে আজীবন সংযুক্ত ছিলেন, তা সুপরিজ্ঞাত। এ কথা তাই অবিস্মরণীয়—রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমি বাংলা দেশ; বাঙালীর স্মৃতিলোক, বাঙালী ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সমাবেশে যা রচিত; এবং তৃতীয়তঃ সর্বমানবচিত্ত-মহাদেশের সেই প্রাঙ্গণটি, যেটি বাঙালী চিত্তের অঙ্গন, যেখানে তার জন্মকালে রেনেসাঁসের আলোড়নে আধুনিক যুগধর্ম বা মানবতার আধুনিক চেতনা উন্মেষিত হয়ে উঠ্‌ছিল। এই পরিবেশেই রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছেন—উনবিংশ শতকের বাঙলাদেশের পরিবেশে, আর জাতীয় জীবনের সেইক্ষেত্র থেকেই অতিক্রান্ত হয়েছেন মানব-ভূমায়—ভূমিভ্রষ্ট নয় যে ভূমা।

কথাটা 'বাঙালিয়ানা'র বশে বলছি না, বরং বলছি অন্য কারণে। প্রথমতঃ রবীন্দ্র-প্রতিভা জিজ্ঞাসার সৎ-পদ্ধতি নির্ণয়ের দাবিতে, দেশের মাটি জল থেকেই প্রাণরস গ্রহণ করে কি করে তা বিশ্বাভিমুখে আত্মবিস্তার করেছে, তাই হওয়া উচিত সে জিজ্ঞাসার স্বাভাবিক পদ্ধতি। দ্বিতীয়তঃ, বাঙলা সাহিত্য ও জাতীয়জীবনে রবীন্দ্রপ্রতিভা যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে তা-ও

অনুধাবন করা উচিত। কবির শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রপ্রতিভার জিজ্ঞাসায় 'পাশ্চাত্য প্রভাবের' ও বিশ্বমুখিতার কথা যত বিঘোষিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের বাঙালী ঐতিহ্যের কথা বা বাঙালী ভূমিকার কথা তত আলোচিত হয়েছে কিনা জানি না। অপর দিকে, আবেগ-আতিশয্যে আমরা বাঙালীরা তাঁকে "আমাদের" বলে নিশ্চয়ই গর্ব করেছি; কিন্তু কী অর্থে তা সত্য সম্ভবত তা যথেষ্ট পরিমানে বুঝে দেখতে চাইনি। পরিমিত পরিসরে সেই কথাটিই আমার আলোচ্য। রবীন্দ্রনাথকে একান্তভাবে বাঙালী বলে সীমাবদ্ধ করাও যেমন আমার বিবেচনায় হাস্যকর, রবীন্দ্রনাথের জন্মক্ষেত্র যে বাঙলাদেশ, তাঁর সৃষ্টিক্ষেত্র বাঙলা সাহিত্য, তাঁর চিত্তক্ষেত্রও বাঙালী চিত্তের সুমহৎ বিস্তার, এই কথা অস্বীকার করা আমার মতে তেমনি অসম্ভব।

এই শেষ কথাটা অবশ্য পরিষ্কার করে বোঝার অপেক্ষা রাখে। বাঙলাদেশে এমন বাঙালী ভাবুক ও লেখক এক সময়ে যথেষ্টই ছিলেন যাঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিক্ষেত্র থেকে এ কথায় আপত্তি তুলতেন। কেউ মনে করতেন, বাঙালী ঐতিহ্য নয়, বিশ্বভাবনার শূন্যলোকেই রবীন্দ্রনাথ বিচরণ করতেন। আবার কেউ মনে করতেন বাঙালী ঐতিহ্য অপেক্ষা ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাই রবীন্দ্রপ্রতিভাকে প্রভাবিত করেছে বেশি। 'নারায়ণ'-গোষ্ঠীর সাহিত্যিকরা মনে করতেন, বাঙালী প্রাণের মধ্যে রবীন্দ্রসাহিত্যের শিকড় নেই, পরভুজের মতো তা আলো আহরণ করে বিশ্বভাবনার আকাশ থেকে। পরবর্তীকালে মনস্বী বিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্রকৃতিতে বাঙালী স্বাধীন চিন্তার, যুক্তিবাদিতার ও মানবধর্মিতার যুগোপযোগী প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন (Golden Book of Tagore-এ লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু প্রায় সেই সময়েই মোহিতলাল মজুমদারের মতো রবীন্দ্রভক্ত সমালোচক রবীন্দ্রসৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন বাঙলার জীবন-নিষ্ঠ সাধনার পরিবর্তে ভারতীয় অধ্যাত্মনিষ্ঠ সাধনার আতিশয্য। বিপিনচন্দ্র বাঙলার বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক সাধনধারার প্রবল গ্রহণ শক্তির ও উদার মানবতার বিকাশ দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথে। মোহিতলাল বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক ধরণের জীবনলীলা স্বীকৃতিরই অভাব দেখলেন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে; পেলেন উপনিষদের ব্রহ্মবাদ ও অধ্যাত্মচেতনার একাকারিত্ব। বোঝা যায়, মোহিতলালের চক্ষে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাঙালী ঐতিহ্যে বিরোধ মূলগত। বিপিনচন্দ্র নিশ্চয়ই ভিন্ন মতাবলম্বী।

ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ

এমন লোক বোধহয় কমই আছেন যাঁরা মনে করেন বাঙালী সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে মূলগত বিরোধ আছে। বাঙালী সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্বন্ধ জানা তাই আবশ্যক, আর ঐতিহ্য কথাটারও অর্থ পরিষ্কার করে বোঝা প্রয়োজন। কারণ, নিশ্চয়ই বাঙালী সংস্কৃতি একটা বিশিষ্ট জিনিস—যদিও সে বৈশিষ্ট্য কী—নব্যন্যায় না তন্ত্র না বৈষ্ণব সাধনা, কোন্‌টি কোন্‌টি বাঙালী মানসের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, তা নিয়ে তর্ক চলে। কিন্তু সে বৈশিষ্ট্য কি ভারত-সংস্কৃতিতে অগ্রাহ্য? তাই ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ বোঝাও দরকার। কারণ, বাঙালী, হিন্দুস্থানী, তামিল, তেলেগু সকলের দেশকে নিয়ে যেমন ভারতবর্ষ, তেমনি এই বাঙালী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি সকল জাতিকে নিয়েই ভারতীয় 'মহাজাতি'। ভারত-সংস্কৃতিরও তাই দু-টি রূপ আছে। একটি সর্বভারতীয় বা Pan-Indian সামান্য (Common) রূপ—তা বাঙলার সংস্কৃতিরও আপনার, তামিল তেলেগুর হিন্দুস্থানী-মারাঠীরও আপনার। কারও পর নয়, কারও একারও নয়। এই কেন্দ্রমূলকে আশ্রয় করেই ভারতীয় বিভিন্ন জাতির স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে। আবার সকলের বৈশিষ্ট্যকে তখন সম্মেলিত করে দেখা যায় ভারত-সংস্কৃতির আর-এক রূপ—তার সর্বসম্মেলিত বা Composite রূপ। মধ্য যুগের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় সাধনায় যত বৈচিত্র্য দেখা দিক তা সকলই মূল ভারতীয় সম্পদে পরিণত হয়েছে; বাঙালী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি সকল ভারতবাসীর সেই Pan-Indian heritage, সমান উত্তরাধিকার। বৈদিক সাধনা, পৌরাণিক হিন্দু সাধনা, বৌদ্ধ সাধনা, জৈন সাধনা প্রভৃতি এ-রূপই সকলের আপনার। স্থান ও কাল ভেদে এসব সাধনার যত বৈচিত্র্য বিকশিত হোক তার কোনো রূপই বাঙালীর, হিন্দুস্থানীর, তামিলের কারও পর নয়, কারও একারও নয়। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের কথা ওঠে কতকটা মধ্য যুগের চৈতন্য, নানক, কবীর প্রভৃতির সাধন ধারা প্রসঙ্গে। বৈষ্ণব, শিখ প্রভৃতি কোনো কোনো গোষ্ঠীর তা বিশিষ্ট সাধন ধারা এবং ভারতের সর্বত্র তা সম প্রচলিত নয়। কিন্তু তা-ও মূল ভারতীয় সাধনারই প্রকাশ, সেই সাধনার অন্তর্ভুক্ত, এবং সর্বস্বীকৃত। এরূপ মূল ও বহুবিচিত্র ধারার সমবায়ে ভারতের সম্মেলিত সংস্কৃতি গঠিত। বাঙালী সংস্কৃতিও তাই এই ভারত (Composite) সংস্কৃতির এক ধারা,

আর সেই Pan-Indian heritage বা সর্বভারতীয় উত্তরাধিকারও তাই বাঙলার ঐতিহ্যের এক প্রধান অঙ্গ।

বাঙালী ঐতিহ্যের স্বরূপ

যিনি মনে করেন উপনিষদের অধ্যাত্মবাদ বাঙালী বৈশিষ্ট্যের বিরোধী তিনি যে শুধু ভারত-সংস্কৃতির স্বরূপ সম্বন্ধেই অজ্ঞ তা নয়; বাঙালী সাধনা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধেও ভ্রান্ত। কারণ নিছক বাঙালী বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাঙলার সংস্কৃতি ও বাঙালী ঐতিহ্য গঠিত নয়—কোনো ঐতিহ্য বা সংস্কৃতিই সেরূপ গঠিত হয় কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ যা বাঙলার সংস্কৃতি বা বাঙলার ঐতিহ্য সমগ্রভাবে তার পরিচয় গ্রহণ করলে দেখি—তার একটি অংশই মাত্র বাঙলার নিজস্ব। বাঙলাদেশের মাটি-জল ও লোকজীবন তার আশ্রয়, বাঙলার লোক-মানসে তার উদ্ভব। বিদেশী পরিভাষার অনুসরণে এই নিজস্ব বাঙালী অংশকে বলতে পারি Matter of Bengal, খাঁটি বাঙলার সম্পদ। মঙ্গলকাব্যের কথায় ও পদাবলীর ভাব সম্পদে তার উপাদান মিশে আছে, নিশ্চয়। কিন্তু নব্যন্যায়, তন্ত্র বা বৈষ্ণবসাধনা—তার অবিমিশ্র ফল কিনা সন্দেহ। বরং ছড়া, গান, রূপকথা, উপকথা এবং সহজিয়া সাধনার নানা সূক্ষ্ম স্থূল ভাবে ও রূপে বাঙালী লোক-জীবনের ও লোক-মানসের সেই দান সঞ্চয়িত হয়ে আছে অনুমান করতে পারি। লোকচিত্তের এই সম্পদ নানা ভাবেই এখন আচ্ছন্ন, কিন্তু তা লুপ্ত হয়েছে কিনা সন্দেহ। যন্ত্রশিল্পের প্রচণ্ডতায় যদি এই লোক-জীবন উন্মূলিত হয়ে যায় তখনি আসবে তার বিলুপ্তির দিন—তার পূর্বে নয়।

কিন্তু বাঙলার এই নিজস্ব বস্তুকে আচ্ছাদিত করেই বাঙলার সংস্কৃতিতে বহুযুগ থেকে এসে মিশেছে সেই সর্বভারতীয় সম্পদ ও ভারতের সম্মেলিত সংস্কৃতির উপকরণ। বিদেশী পরিভাষার অনুসরণ করে একে বলতে পারি—এ হচ্ছে বাঙালী ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত Matter of Indian world, ভারতীয় সম্পদ। এ-যে কত বিরাট ও বিচিত্র উত্তরাধিকার এক সময়ে আমরা তা বিস্মৃত হয়েছিলাম, আমরা মনে করতাম—স্মৃতি, শাস্ত্র, পুরাণ, জ্যোতিষ, কিংবা পৌরাণিক হিন্দু সাধনাই বুঝি আমাদের সব। বৈদিক সংস্কৃতিও প্রায় অবজ্ঞাত হয়ে পড়েছিল। এখন আমরা জানি—বৈদিক বা পৌরাণিক হিন্দু সাধনাই শুধু নয়, বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি প্রাচীন সাধনা, এমন কি মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনও আমাদের

এই ভারতীয় উত্তরাধিকারেরই অন্তর্ভূক্ত। তৃতীয় যে সম্পদ আমাদের ঐতিহ্যে এসে মিশেছিল এই দুয়ের তুলনায় তা ক্ষীণকায়। তা Matter of Perso-Arabic world, পার্শী-আরব্য সংস্কৃতি প্রবাহ মুসলমান বাঙালীর ধর্মাচরণে ও বাঙালীর আইন-আদালতে, পোষাকে-পরিচ্ছদে তা কতকটা স্থায়ী হয়েছে। কিন্তু মূলতঃ এই পার্শী-আরব্য-সংস্কৃতি মধ্যযুগেরই চিত্তসম্পদ। সেই দিক থেকেও ভারতীয় সংস্কৃতির তুলনায় তার চিত্তসম্পদ কম বিচিত্র, কম ঋদ্ধিমান, কম মহত্ত্বপূর্ণ। যেটুকু অভিনবত্ব তাতে ছিল তা মধ্যযুগের ভারতীয় মরমিয়া সাধনায় ও লোকসাধনায় গ্রাহ্য হয়েছে। তা ছাড়া সিন্ধী, পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী জীবনে তা বিস্তার লাভ করবার যতখানি অবকাশ পেয়েছে বাঙালী জীবনে ততখানি সময় ও সুযোগ সে পায় নি। অষ্টাদশ শতকের উচ্চবর্গের মধ্যে তা প্রসারলাভ করতে না করতেই তার পথ বন্ধ হয়ে গেল ইংরেজদের রাজ্যলাভে—আর মধ্যযুগের অবসানে। এল যুগান্তর ও আধুনিক যুগের দুকূল-প্লাবী জোয়ার। তাতে অবশ্য চতুর্থ এক মহাসম্পদও লাভ হলো।

উনবিংশ শতকের প্রারম্ভেই আমাদের বাঙালী জীবন এই সমাগত আধুনিক যুগের ঘাত-প্রতিঘাতে নবান্বিত হতে আরম্ভ করে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের দান বহন করেই এতদিন পর্যন্ত বাঙালী সংস্কৃতি ও বাঙালী ঐতিহ্য রচিত হচ্ছিল। তাকে কেন, সমস্ত ভারত-জীবনকেই আবর্তিত করল ইতিহাসের নতুন শক্তি। এই যুগধর্মকে গ্রহণ করতে না পারার অর্থ মৃত্যু। ইতিহাসের এই শক্তিকে আপনার করে নেবার সাধনা বাঙলাদেশে আরম্ভ হলো রামমোহন থেকে। তাতেই আয়ত্ত হলো চতুর্থ এক নূতন সম্পদ। এ সম্পদকে সাধারণত বলা হয় Matter of Western World—পাশ্চাত্ত্য জগতের সম্পদ।

ঐতিহ্যের রূপান্তর

এই আখ্যাটা বিজ্ঞানসম্মত নয়। কিন্তু সেজন্য এইখানে ইতিহাস-বোধের একটু প্রয়োজন। তা না থাকলে দু রকমের ভুল আমরা করি। প্রথমতঃ মনে করি ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি বুঝি একটা স্থাণু জিনিস, তার পরিবর্তন নেই। কালে কালে তার পুনরাবর্তন ও অনুবর্তনই চলে; যুগান্তরেও তার রূপান্তর নিষ্প্রয়োজন, কারণ, রূপান্তরের অর্থ তার স্বধর্মচ্যুতি। বলা বাহুল্য, একথা সত্য হলে বাঙালী ঐতিহ্য গঠিত হতেই পারত না, বাঙালী ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় উত্তরাধিকারকে

আপনার করেই আমাদের এই ঐতিহ্যের জন্ম। মধ্যযুগের পার্শী-আরব্য দানকে গ্রহণ করতে তো তার বাধে নি। যুগান্তরে আধুনিক যুগধর্মই বা তা হলে তার অস্বীকার্য হবে কেন? বরং, বলা যায় "সচল মনের প্রভাব সজীব মন না নিয়ে থাকতেই পারেনা।" এই রূপান্তরের প্রচেষ্টায় তার প্রাণশক্তি পায় নূতন প্রকাশ, সে অর্জন করে নূতন জীবনচর্যা, সৃষ্টি করে আপনার নূতন ঐতিহ্য।

দ্বিতীয় ভুলটি এই—এই নবাগত চিত্তসম্পদকে অনেকেই মনে করেন 'পাশ্চাত্ত্য' জীবনধর্ম, আর তাই 'প্রাচ্য' জীবনাদর্শের তা প্রতিকূল। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আমরা বুঝতে পারি এই জীবনচর্যা একান্তভাবে পাশ্চাত্ত্যের নয়, কোনো দেশ বা মহাদেশ বিশেষের নয়। এ সামাজিক বিবর্তনেরই ধর্ম। সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষার সহায় নিলে একটি কথাতেই তার স্বরূপ নির্দেশ করা যায়—এ হচ্ছে 'বুর্জোয়া বিকাশ', অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার ও বুর্জোয়া জীবন-চর্যার বিকাশ। এই বিকাশেই সাধারণভাবে বলা যায় সকল সভ্যতার 'মধ্যযুগ' শেষ হয়, 'আধুনিক যুগ' আরম্ভ হয়। এই জীবনচর্যার মূল সত্য হল 'Rights of Man' মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তি স্বাধীনতার, যুক্তিবাদিতার, রাষ্ট্রজাতিক আত্মপ্রকাশের প্রয়াসের সঙ্গে এই মানবতাবোধই তখন পরিব্যাপ্ত হয় Man's man for a' that. অবশ্য একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন, এই 'বুর্জোয়া ব্যবস্থা' আজ বাসি মাল। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ থেকে তা সাম্রাজ্যবাদী পর্বে পৌছয়। আপনার শ্রেষ্ঠ নীতিসমূহও সে তখন ত্যাগ করে—বিংশ শতাব্দী থেকে উন্নততর সমাজব্যবস্থার আবির্ভাব হয়। আধুনিক যুগধর্মের আশ্রয় এখন সমাজতন্ত্রী-ব্যবস্থা, বুর্জোয়া-ব্যবস্থা নয়। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের, ন্যায়-নীতির-ভাব-সম্পদের শ্রেষ্ঠ মুখপত্র ছিল বুর্জোয়াতন্ত্র, আধুনিক যুগের দিকে তা-ই প্রথম পদক্ষেপ, এই কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু মধ্যযুগের সমাজের তুলনায় বুর্জোয়া সমাজই উন্নতির বাহন; তখনকার বুর্জোয়া-বিকাশও তাই শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণযোগ্য। এ বিকাশ প্রথম ঘটেছে পাশ্চাত্ত্য দেশে, বিশেষ করে ইংলণ্ডে। তাই ইংরেজ এই চিত্তসম্পদের প্রথম অধিকারী, তারপর তার অধিকারী অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য জাতি—প্রাচ্যদেশে তা আসে আরও পরে। তাই আধুনিক যুগধর্মের মধ্যে ইংরেজি বৈশিষ্ট্য ও 'পাশ্চাত্ত্য' বৈশিষ্ট্যের ছাপ যথেষ্ট থাকবারই

কথা। কিন্তু "এহ বাহ্য"। মূল কথাটা এই যে, তা হচ্ছে 'বুর্জোয়া-ধর্ম'—যুগধর্মের প্রাথমিক রূপ। Right of man, মানব মহিমা, বুদ্ধির মুক্তি, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, জাতীয় মুক্তির প্রেরণা এ সবই আধুনিক যুগধর্ম—মধ্যযুগের পাশ্চাত্ত্য ভূমিতেও এসব অগোচর ছিল, প্রাচ্য ভূমিতেও অগোচর ছিল। তা স্বীকৃত হয়েছে বুর্জোয়া বিকাশে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমাজে। আর পাশ্চাত্ত্য সমাজেও তা গৃহীত হয় যখন প্রাচ্য সমাজ বুর্জোয়া বিকাশে উদ্যোগী হয়—মধ্যযুগ ছাড়িয়ে প্রবেশ করে আধুনিক যুগে। মধ্যযুগ প্রাচ্যেও যা পাশ্চাত্ত্যেও তা। প্রভেদ যা তা প্রকৃতিগত নয়, আধারগত, বাহ্য ও আকারাগত। এই আধারগত বৈশিষ্ট্য ধরে সেই যুগধর্মকে 'পাশ্চাত্ত্যগুণ' বলা এখনও সুপ্রচলিত। রবীন্দ্রনাথও 'প্রাচ্য' ও 'পাশ্চাত্ত্য' প্রভৃতি শব্দ এরূপ অর্থে প্রয়োগ করেছেন। এরূপ 'প্রাচ্য' বলতে বোঝায় মধ্যযুগের প্রাচ্য,—বুর্জোয়া বিকাশের পূর্বেকার প্রাচ্য। অথচ পাশ্চাত্ত্য বলতে বোঝানো হয় আধুনিক যুগের পাশ্চাত্ত্য—বুর্জোয়া বিকাশে সমুত্তীর্ণ পাশ্চাত্ত্য। ঐতিহাসিক বুদ্ধিতে এই Matter of the Western World-কে 'বুর্জোয়া চিত্ত সম্পদ', অন্ততপক্ষে, 'আধুনিক যুগধর্ম' (Modernism) বলাই শ্রেয় ; তা হলে অনেক বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়।

এখন পূর্ব প্রসঙ্গে আসা যাক। কথাটা এই—রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বেই আধুনিক যুগ-প্রকৃতি ভারতীয় সমাজে উন্মেষিত হতে আরম্ভ করে। বাঙলা দেশই হয় তার বিকাশক্ষেত্র। বাঙলার ঐতিহ্যের তখন মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের কাল। রবীন্দ্রনাথও 'কালান্তর' প্রভৃতি বহু প্রবন্ধে এই যুগ-বিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। একইকালে তখন রেনেসাঁসের তাড়নায় ঘটে ঐতিহ্যের নবাবিষ্কার ও যুগধর্মের প্রবর্তনায় ঘটে ঐতিহ্যের নবায়ন। এই রেনেসাঁসের প্রেরণায় স্বাভাবিকভাবেই পার্শী-আরবী সম্পদ গৌণ হয়ে যায়, কিন্তু ভারতীয় সম্পদ ও বাঙলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নবপ্রাণ লাভ করে। আবার, আধুনিক যুগধর্ম বা বুর্জোয়া ভাব-সম্পদের প্রেরণায় বাঙলার ও ভারতের জাতীয় জীবনে রূপান্তর অনিবার্য হয়ে ওঠে। এটা বাঙলারই ঐতিহ্যের শক্তির পরিচায়ক যে, ভারতের মধ্যে এই ভাবসম্পদকে গ্রহণ করার মতো যোগ্যতার প্রমাণ বাঙালীরাই প্রথম দিয়েছে—রামমোহনের ধর্মসংস্কার, বঙ্কিমের সাহিত্য সাধনা, আর বাঙলার জাতীয় মুক্তির আন্দোলন বাঙালীর সেই চিত্তসম্পদেরই পরিচায়ক। আর সেই বাঙালী চিত্তসম্পদের

শ্রেষ্ঠ প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মধ্যেই আমাদের ঐতিহ্যের সেই উজ্জীবন ও রূপান্তরের সামঞ্জস্যময় প্রকাশ সার্থক হয়েছে—এই কথাটিই বুঝবার মতো, এবং তা বুঝে রবীন্দ্রনাথ ও বাঙালী ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ আলোচ্য।

রবীন্দ্রসাহিত্য ও বাঙালী-জীবন

বাঙালী জীবনের মধ্যে রবীন্দ্রপ্রতিভার মূল প্রোথিত, এ সত্য প্রমাণ করবার প্রয়োজন হয় তাদের কাছে বাঙালী ঐতিহ্য সম্বন্ধে যাদের ধারণা অস্পষ্ট—যারা মনে করে রবীন্দ্রনাথের ভারতীয়তা বুঝি তার বাঙালীত্বের পরিপন্থী, কিম্বা বাঙালী ঐতিহ্য বুঝি মধ্যযুগের ধারাতেই আবর্তিত হবে, আধুনিক যুগের নিয়মে রূপায়িত হবার মতো যোগ্যতা বা আবশ্যকতা তার থাকতে নেই। এরূপ ভুল ধারণা না থাকলে রবীন্দ্রপ্রতিভাকে বাঙালী ঐতিহ্যেরই সুমহৎ প্রকাশ বলে গণ্য করা স্বাভাবিক।

বাঙালী জীবনের মধ্যে যে স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত, একথা প্রমাণ করা নিষ্প্রয়োজন। বাংলার মাটি, বাংলার জল থেকে প্রাণরস গ্রহণ করতে না পারলে তিনি সত্য হতে পারতেন না। তাঁর নিসর্গ-কবিতায় বাংলার প্রকৃতি যদি রূপলাভ না করত তা হলেই আশ্চর্য হবার কথা। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি—হয়তো বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ভিন্ন তাঁর তুলনা নেই। তাঁর নিসর্গ দৃষ্টিতে যে অধ্যাত্মানুভূতি দেখা যায় তা যতটা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থীয় তদপেক্ষাও ভারতীয় চিত্তসম্পদেরই সুপরিচিত লক্ষণযুক্ত—যে ভারতীয় সম্পদে বাঙালীরও উত্তরাধিকার। প্রকৃতির শান্ত গম্ভীর উজ্জ্বল মধুর সকল রূপ সম্বন্ধেই তিনি সচেতন। ঋতুরঙ্গের প্রতিটি আবর্তনে তিনি সংবেদনশীল। কিন্তু, বাংলার প্রকৃতি, বিশেষ করে গঙ্গা-পদ্মাবিধৌত এই শ্যামলভূমি বাংলাদেশ এবং কতকাংশে লালমাটির এই রাঢ়ভূমি যে তাঁর কবিতায়, গানে, গল্পে, বর্ণনায়, পূর্বাপর আত্মবিস্তার করে আছে, তা স্থূল দৃষ্টিতেও প্রত্যক্ষ। কবিচৈতন্যে যে কত সূক্ষ্মভাবে এই বাংলার প্রকৃতির রূপ মিশে আছে তা অনুভব করা যায় তাঁর রূপকল্পের বিশ্লেষণে, কিম্বা তাঁর বর্ষার কবিতার কথা ও সুরে, শরৎ-বর্ণনার শুভ্র আলোক-অঞ্জলীতে। বাঙালী কবি ভিন্ন কার কল্পনায় সম্ভব হতো 'সোনারতরী' ? সে কবিতার সমস্ত পরিবেশটিই বাংলার, বিষণ্ণ বঞ্চিত বাঙালী কৃষক জীবনই সেই রূপকের আধার। একথা কি মিথ্যা যে, কৃষ্ণকলি তাকেই কবি বলেছেন—ময়নাপাড়ার মাঠে

দেখেছিলেন যার কালো হরিণচোখ—সে মেয়ে চিরন্তনী, সেই শ্যামলা বাংলাদেশ। এরূপই বলা যায়, বাঙালীচিত্তের গীতিপ্রবণতার ঐতিহ্য মিশে আছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, গানে, এমনকি ছোটগল্পেও। যে ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের সার্থকতা গীতিকবিতার অপেক্ষা কম নয়, তা যেন বাংলার মাটি-জল-আকাশে ঘেরা জীবনরঙ্গের শ্রেষ্ঠ কাব্য, প্রকৃতি ও মানুষের সমন্বিত পরিচয়। এই কারণেই কি বিদেশীদের নিকট রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সরস মাধুর্য সহজগ্রাহ্য হয় না ?

চিত্তসম্পদের বিচারে, বাংলার বৈষ্ণব-লীলারসের নতুন পরিবেশন যে রবীন্দ্রকাব্যে ও গানে ঘটেছে, একথা বহু প্রচলিত। কথাটা সত্যই উল্লেখ-যোগ্য। কারণ, বৈষ্ণব-রস-সম্পদে রামমোহন ও বঙ্কিম প্রভৃতি বাংলার রেনেসাঁসের পুরুষেরা বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। সম্ভবত মহর্ষিও তাতে স্বস্তিবোধ করতেন না। তাই রবীন্দ্রচেতনায় রাগানুগা ভক্তি ও লীলা কীর্তনের পদাবলীর এই আকর্ষণ নিশ্চয়ই স্মরণীয় জিনিস। এক অর্থে তিনি বঙ্কিমের অপেক্ষাও বেশি বাঙালী। কিন্তু সেই সঙ্গে লক্ষনীয়—রবীন্দ্রনাথ 'উজ্জ্বল নীলমণি'র নির্দেশিত পথে পদরচনা করেন নি, রস-আস্বাদনও করেন নি। সেই প্রেমোন্মত্ততা ও রস-বিহ্বলতা 'চতুরঙ্গ'-এর কবির কাম্য ছিল না। কাব্যরসিক, জীবনরসিক হিসাবেই তিনি প্রধানত বৈষ্ণবপদাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে-ছিলেন। তেমনি কি শিব-উমা ও নটরাজ-।শবের কল্পনাও তাঁর কবি চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে নি ? আসলে তত্ত্বের দিক থেকে সম্ভবত শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা কবীরই ছিলেন তাঁর নিকটতর। আসলে বাংলার বৈষ্ণব প্রেরণা অপেক্ষা বাংলার বাউলের প্রেরণাতেই তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। এই কথা এ প্রসঙ্গেই উপলব্ধি করা উচিত যে, নব্যন্যায়, তন্ত্রসাধনা, বৈষ্ণবসাধনা অপেক্ষাও লোকচিত্তের গভীরেই খাঁটি বাংলার ঐতিহ্য নিহিত আছে। এই লোকচিত্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় আত্মীয়তা ছিল। বাংলার ছড়া, গান, রূপকথা, এ-সবেরও উদ্ধার ও প্রথম সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথ অগ্রণী হন। তেমনি শিল্পসম্মত পদ্ধতিতে আপন সৃষ্টির মধ্যেও সেই ছড়া, গান, সুর এবং লোকসংস্কৃতির ভাব-লোক ও রূপলোককে আত্মসাৎ করতে ছাড়েন নি। একটু অন্তর্দৃষ্টি থাকলে, রবীন্দ্রচেতনায় বাংলার লোকসংস্কৃতির রেশ যে বহুভাবে মিশে আছে তা অনুভব করা যায়। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব অপেক্ষা তা কম গভীর নয়।

অবশ্য শুধু বাংলার মাটি, বাঙলার জল ও বাংলার স্বকীয় উদ্ভাবনা দিয়েই

বাংলার মানুষের চিত্তদেশ গড়ে ওঠে নি। বাংলার স্মৃতিলোক ভারতীয় উত্তরাধিকারেও পরিপুষ্ট—প্রাচীন ও মধ্যযুগের সকল ভারতীয় উত্তরাধিকারই তার আপনার। আর, রবীন্দ্রনাথ এই কথা সুস্পষ্ট করে তুলেছেন—এই ভারতীয় চিত্তসম্পদের শ্রেষ্ঠ প্রকাশও বাঙালী ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতমানস

ভারতীয় সাধনার যেরূপ সর্বাঙ্গীন পরিচয় আমরা রবীন্দ্রসাধনায় লাভ করেছি তা মহাভারত ছাড়া আর কোথাও পাইনা। বৈদিক কাল থেকে পৌরাণিক কালের সূচনা পর্যন্ত সুদীর্ঘ, বিচিত্র ভারত-জীবন মহাভারতের মধ্যে বিধৃত আছে। পৃথিবীতে এমন মহৎগ্রন্থ আর নেই। কিন্তু ভারতজীবন ও ভারতসাধনা সে যুগের পর স্তব্ধ হয়ে থাকে নি। বহুবিচিত্র বৌদ্ধ সাধনায় ও সুদীর্ঘকালীন জৈন সাধনায় ভারতসাধনা পরিস্ফুট হয়েছে। গুপ্তযুগের হিন্দু পুনরুজ্জীবনে, কালিদাস প্রভৃতির কাব্যে ও তৎকালীন শিল্পে তার নূতন অভ্যুদয় ঘটেছে। তারও পরে ইসলামীয় ঘাত-প্রতিঘাতে নানা সাধুসন্তের সাধনায় তা বিকশিত হয়ে উঠছে। ভারতীয় সাধনার এই বৈচিত্র্যময় ঐক্যের অনুধাবন যদি কোনো একটি প্রতিভার দানে করতে হয় তবে একমাত্র রবীন্দ্রপ্রতিভাতেই তা সম্ভব। যাঁরা মনে করেন রবীন্দ্রসাহিত্য শুধু উপনিষদের বাণীতেই প্রবুদ্ধ, তাঁরা বিস্মৃত হন—মহাভারতের সত্য-ই কি তিনি কম সঞ্জীবিত করেছেন, শিব মহেশ্বর বা নটরাজের ধারণাকেই কি তিনি কম স্বীকৃতি দিয়েছেন ? তারপর, রবীন্দ্রপ্রতিভা বৌদ্ধ সাধনার গভীর সত্যকেও আমাদের সাহিত্যে পুনরুজ্জীবিত করেছে। কালিদাসের শিল্প-সুষমা ও জীবনাদর্শ তা আপন সৃষ্টিতে সঞ্চারিত করেছে। মধ্যযুগের সাধক সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধনাকেও তা অপূর্ব রস-নিষেকে জীবন্ত করে তুলেছে। মহাভারতের পরে ভারতীয় চিত্তের কাব্য-সুষমাময় ও সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ রবীন্দ্রসাহিত্যেই সম্ভব হয়েছে। আমরা গৌরব করতে পারি—বাংলাভাষার আধারেই ভারতের এই যুগে যুগে প্রকাশমান বাণী প্রথম সার্থক রূপ লাভ করেছে।

ভারতমানসের এই প্রকাশ যে বাঙালী ঐতিহ্যেরই প্রকাশ, এ কথা আমরা পূর্বেই অনুধাবন করেছি। এই প্রসঙ্গটি এখন শুধু বোঝা প্রয়োজন : এ শুধু প্রকাশ নয়, বিকাশও। রামমোহন থেকেই আমাদের দেশে এই ভারত সাধনার পুনরাবিষ্কার আরম্ভ হয়। অবশ্য তাতে আমাদের পথ প্রদর্শন করেন

এশিয়াটিক সোসাইটির মানববিদ্যার পণ্ডিতগণ। মধ্য যুগের গতানুগতিক অভ্যাসের মধ্যে, ন্যায়-স্মৃতি-জ্যোতিষের বিচার বিতর্কের মধ্যে ভারতের সেই চিত্ত সম্পদের কতটুকু ছিল জীবিত? মধ্যযুগের বাঙালী ঐতিহ্যে কতটুকু সন্ধান পেতাম আমরা বেদ ও উপনিষদের সংস্কৃত ভাষার বিচিত্র ঐশ্বর্যের, বৌদ্ধ সাধনার বা জৈন সাধনার? আধুনিক যুগে প্রবেশের ফলেই আমরা জানলাম এই মহান ভারতবর্ষকে, তার মহৎ সভ্যতাকে, আমাদের বিস্মৃতপ্রায় এই উত্তরাধিকারকে। বেদ ও উপনিষদের সঙ্গে নূতন করে পরিচয় হলো, বুদ্ধ ও অশোক পুনরাবিষ্কৃত হলেন। এমনকি সংস্কৃতিরও মহান্ সম্পদের পুনরুদ্ধার তখন থেকে সম্ভব হলো। কথাটা এই : এ শুধু পুনরুদ্ধার নয়, রেনেশাঁসের এই দানে তখন বাঙলার ঐতিহ্য নবায়িত হতে আরম্ভ করে। ভারত-সংস্কৃতির এই আবিষ্কারের অর্থ এই উত্তরাধিকারের নবমূল্যায়ন—আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, বৈজ্ঞানিক চক্ষে, মানবতার নূতন আলোকে। সেই আলোকেই বাংলার ঐতিহ্যের তখন থেকে রূপায়ণ আরম্ভ হয়—রামমোহনের মুক্ত বুদ্ধিতে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য দৃষ্টিতে ও জাতীয় জীবন রচনার প্রয়াসে; এবং শেষে জাতীয় আন্দোলনে জাতীয় জীবনের বহুমুখী রূপায়ণের সাধনায়। এই তিন ধারারই যখন পরিণতি ঘটল রবীন্দ্রকৃতিতে, তখন মধ্যযুগের বাঙালী ঐতিহ্য রূপায়িত হতে হতে লাভ করল রূপান্তর। পূর্বেকার বাঙলা ঐতিহ্যের সঙ্গে বাঙলার এই নবায়িত ঐতিহ্যের যে যোগ নেই তা নয়। সেই লোকসংস্কৃতির উপকরণ, সেই সর্বভারতীয় উত্তরাধিকার, এমন কি পার্শী-আরব্য সঞ্চয়, কিছুই অচল হয় নি। কিন্তু সবই রামমোহনের পর থেকে নবায়িত হয়ে স্বীকৃত হয়, আধুনিক যুগের যুক্তি ও শিল্পাদর্শ, জীবনবোধ ও মানবতাবোধের পরীক্ষায় যা উত্তীর্ণ তাই গ্রাহ্য। মধ্যযুগের বাঙলা ঐতিহ্যের সঙ্গে তাই এই বাঙালী ঐতিহ্যের পার্থক্য শুধু পরিমাণগত নয়, প্রকৃতিগত।

রবীন্দ্র-উত্তরাধিকার

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যের পরে বঙ্কিমের দানকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ এই পার্থক্যই অনুভব করেছিলেন—"কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য।" এরূপ বিস্ময়েই আমাদের আবার অভিভূত

করে যখন শতবর্ষ পূর্বেকার বাঙলা সাহিত্যের সূচনাকে আজকের বাঙলা সাহিত্যের সম্পদের সঙ্গে তুলনা করি। মধুসূদন-বঙ্কিম যার সূচনা, রবীন্দ্রনাথে তা লাভ করেছে পরিণত শ্রী ও শক্তি। বাঙলা সাহিত্যের আজও অভাব অনেকদিকে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দানের পরিমাপ এই কথাতেই করা যায় যে—বাঙলা সাহিত্য আজ সৃষ্টি-সম্পদে ও ভাব-সম্পদে যথার্থ আধুনিক-সাহিত্য, বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে তার স্থান এখন স্বীকৃত। সহস্রমনাঃ রবীন্দ্রনাথ মানবচিত্তের সমস্ত প্রকাশেই যেমন তাকে সামর্থ দান করেছেন, তেমনি একটি অখণ্ডবোধেও তাকে দীক্ষিত করে গিয়েছেন। সেই বোধ মানবতাবোধ—বাঙলা সাহিত্যের এইটিই বিশিষ্ট রবীন্দ্র-ঐতিহ্য।

আমাদের জাতীয় জীবনের দিক থেকেও আবার এই কথাই বলা যায়। আমাদের জাতীয়তায় রবীন্দ্রনাথের দান কর্মে, চিন্তায় ও রসসম্পদে অসামান্য। যেমন, 'স্বদেশী সমাজ'-এ ও আত্মশক্তির নীতিতে তা সুস্থির ভিত্তিভূমির সন্ধান দিয়েছে। বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যের প্রকাশ উদ্ঘাটন করে তা মহাজাতি গঠনের পথ নির্দেশ করেছে। কিন্তু জাতীয়তার সাময়িক প্রয়োজন ছড়িয়েও রবীন্দ্রনাথ জাতীয় জীবনকে সমগ্রভাবে দেখতে জানতেন বলেই তিনি আমাদের জাতীয়তাকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত থাকবার শিক্ষাও দিয়ে গিয়েছেন। সমাজ সংগঠনের বাস্তব ক্ষেত্রে তাই অভিপ্রেত ছিল বিজ্ঞানের কল্যাণকর প্রয়োগের দ্বারা ধনসৃষ্টি, আর সমবায়িক নীতিতে সমাজবিন্যাসের দ্বারা সামূহিক কল্যাণ—সম্ভবত Cooperative commonwealth রূপে জাতীয় জীবনের বিকাশ। কিন্তু এই সমস্ত সামাজিক রাষ্ট্রিক নীতি পদ্ধতি ও কৌশল মোটেই আসল কথা নয়, তা শুধু বিশেষ আদর্শ উপলব্ধির উপায়। সেই বিশেষ আদর্শ 'সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব'। "রাষ্ট্রের প্রশস্ত ভূমি না পেলে জনসমূহ পৌরুষবর্জিত হয়ে থাকে।" কিন্তু "স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে ও সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্য রূপে পাওয়া"তেই জাতীয়তার সার্থকতা। 'ন্যাশন্যালিজম'-এর বুর্জোয়া সঙ্কীর্ণতা ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় জীবনকে এই বিশ্বমানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবার শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দান সেই 'ভারতীর্থ'র আদর্শ, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে বিশ্বমানবের মিলনব্রত উদ্যাপনের দায়িত্ব।

এই মানবতার ঐতিহ্যই রবীন্দ্রঐতিহ্য। রবীন্দ্র-উত্তরাধিকার লাভ করেছি

বলেই এই রবীন্দ্রঐতিহ্যও আমাদের বাঙালীর ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যে আমাদের বাঙালী চিত্তক্ষেত্র শুধু আধুনিক কালের চিত্তসম্পদকে গ্রহণ করতেই প্রস্তুত হয়নি, আগামী কালের চিত্তসম্পদ সৃষ্টিরও প্রেরণা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙলার ঐতিহ্যকে রূপায়িত করেন নি তাতে নতুন ঐতিহ্যও সৃষ্টি করে গিয়েছেন। তাঁর প্রতিভার দানে আমাদের অতীতকালীন ঐতিহ্য বর্তমানে পৌঁছে আগামী কালের দিকে উন্মোচিত হয়ে চলছে। তাই এই বাঙলা দেশ, বাঙালী জীবন ও বাঙলার চিত্তভূমিতে জন্মেও এই সত্য উপলব্ধি করবার দায়িত্বও একালের বাঙালী লাভ করেছে—"মানুষ জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে, জন্মগ্রহণ করে নিখিল ইতিহাসে।…তার তৃতীয় বাসস্থান মানবচিত্তের মহাদেশ॥"

শান্তিনিকেতন বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে (২৫শে জানুয়ারি, ১৯৬২) পঠিত।

আদর্শ ও বাস্তব

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

জীবন যখন একান্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে, তখন জীবিকা অর্জনের পন্থা ও পদ্ধতি নিয়ে মানুষের আর কোনো বাচ্‌বিচার থাকে না; সে তখন কুৎসিৎ হতেও লজ্জা পায়না। আবার আদর্শ যখন ব্যোমচারী ও উৎকটভাবে সাত্ত্বিক হয়ে ওঠে, বাস্তব তখন লজ্জায় আধমরা হয়ে যায়। দর্শন যদি মাটি ছেড়ে যায়, ধর্ম তখন মাটি কামড়ে, কাদা মেখে বীভৎস হয়ে ওঠে।

দর্শনে ও ধর্মে, আদর্শে ও বাস্তবে, জীবনাদর্শে ও জীবিকাসংস্থানের মধ্যে যখন গাঁটছড়া পড়ে তখন তাকে পাকা গাঁটকাটাও ছিন্ন করতে পারে না।

মানুষ জীবনকে সার্থক করার জন্য তার অর্থ খুঁজছে যুগযুগান্ত থেকে, তাই এত মত, এত পথ। অসংখ্য গুরু, অবতার ও দেবতা—সকলেই জীবনদর্শনের দাওয়াই বিজ্ঞাপিত করছেন।

রবীন্দ্রনাথও আদর্শ প্রচার করেছেন এবং জীবনের কর্মে তা রূপান্তরিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে গুরুদেব নামটি পেয়ে তিনি কখনো গুরুগিরি করেন নি। তিনি নিবিড় ভাবেই মানুষ ছিলেন, নিজ জীবনে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিচিত্রের স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। মুক্তি তিনি চাননি। রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শে ছিল সবার মুক্তি কামনা।

আজকার দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন একটা উন্মাদাগারে বাস করছি। প্রশ্ন জাগে মনে—এর থেকে আমাদের মুক্তি দিতে পারে কে, শান্তি আনতে পারে কে! সে পারে কবি। রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' স্মরণীয়: "একদিন ওরা ভাববে রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই। দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে—জয় আমাদের হাল, লাঙ্গল, চরকা, তাঁতের। তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।"

প্রশ্ন ওঠে রথ তারা চালাবে কিসের জোরে। বিদ্রূপ করে পুরুত ঠাকুর বলেন কবিকে—"তখন যদি রথ আর একবার অচল হয়, বোধ করি তোমার

মত কবিরই ডাক পড়বে—তিনি ফুঁ দিয়ে ঘোরাবেন চাকা"। কবি বলেন "নিতান্ত ঠাট্টা নয়, রথযাত্রায় কবির ডাক পড়েছে বারে বারে।"

"রথ তারা চালায় কিসের জোরে ?"

"গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে। আমরা মানি ছন্দ, জানি একঝোঁকা হলেই তাল কাটে। মরে মানুষ অসুন্দরের হাতে, চালচলন যার একপাশে বাঁকা। আমরা মানি সুন্দরকে। তোমরা মানো কঠোরকে—অস্ত্রের কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোরকে। বাইরে ঠেলা মারার উপর বিশ্বাস, অন্তরের তালমানের উপর নয়।"

ছন্দ-ছাড়া, তালভঙ্গ হয়েছিল বলেই তো উর্বশীর নির্বাসন হয়েছিল অমরাবতী থেকে।

আজ দিকে দিকে শান্তির বাণী ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু কোথাও শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, বিশ্রাম নেই, স্তব্ধতা নেই। "ভিতরে রস না জমিলে বাইরে কি গো রঙ ধরে"—বাউলের গান মনে হচ্ছে। যে জন শান্তির বাণী শোনাচ্ছে, তার মনে সে 'শান্তম' এর স্থান করে নেয় নি। আমাদের পূজা-পার্বণে শান্তিবচন পাঠ হয়—তার ফলও যেমন নিষ্ফল, আজ জগৎব্যাপী শান্তি শান্তি রব তেমনি অনেকক্ষেত্রে expediency-র স্লোগান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যখনই মানুষ ভুলে গেছে সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ধর্ম ও নীতির উপর, তখনই কোন্ অদৃশ্য রন্ধ্র দিয়ে শনি প্রবেশ করেছে—কত ছদ্মবেশে, কত ছদ্মনামে। বিষিয়ে তুলেছে বিশ্বকে তার নিশ্বাসে! সর্ব মানবের কল্যাণ-কামনা যদি সুবিধাবাদের স্তর থেকে উদ্ভূত হয় ও কল্যাণ-সাধনা যদি বিশেষ মত বা গোষ্ঠির সমর্থন সাপেক্ষ হয় তবে সেখানেও বিধাতার বজ্র পতিত হয়। সেই জন্য বারে বারে পৃথিবীতে যুদ্ধ এসেছে, আসছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন বা জীবন আদর্শের মুলকথা হচ্ছে 'মানুষের ধর্ম'। আজ কবির মূল্যায়ন করার সময়ে যেন আমরা তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার কথা পাশ কাটিয়ে না যাই। কবির বিবিধ কর্ম ও বিচিত্র বাণীর স্তূপ নির্মাণ করে তাতে সন্ধ্যা-আরতি দিতে পারি, কিন্তু তা স্তূপ পুজা হবে—বোধিচিত্তর প্রাপ্তি হবে না। কবির জীবন দর্শন জানবার প্রয়াস যেন হস্তিদর্শনন্যায়ে পরিণত না হয়। কিন্তু চারি দিকের আলোচনা থেকে মনে হয়—এ যেন অন্ধের হস্তী দর্শনই হচ্ছে। কেউ ধরছে হাতির শুঁড়, কেউ দাঁত, কেউ পা, কেউ লেজ,

প্রত্যেকেই মনে করছে সেটাই হাতি ; আর তা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও বিতণ্ডা ; অবশেষে জীবন্ত দাহ, নির্বাসন, জেহাদ, ক্রুসেড্ চলেছে। কেউ বলছি, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব—কারণ তাঁর কাব্য থেকে অসংখ্য উদাহরণ জমা করা যায়। কেউ বলছেন তিনি রুদ্রের সাধক—শিব-রুদ্রের বহু উপমা তাঁর কবিতায় আছে। কেউ বলছেন তিনি অজ্ঞেয়বাদী, যেহেতু কয়েকটি কবিতায় ও গানে তিনি অজানার জয় গেয়েছেন। তাঁকে আমরা কেউ দেখছি স্বাদেশিক, কেউ আন্তর্জাতিক রূপে ; কেউ শিক্ষাব্রতীরূপে, কেউ নটের সাজে।

বিচিত্রের দূত কবিকে, যার যেমন প্রয়োজন, তেমনি বর্ণনা করেছেন। সবই হয়তো সত্য। এ সমস্তকেই তিনি স্বীকার করেছিলেন নিজের মতো করে।

কবির জীবনদর্শনের মূল উৎস ছিল গায়ত্রী ছন্দে উদ্‌গীত সাবিত্রী মন্ত্রের ধ্যান এবং উপনিষদের "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্" বাণী। ব্রাহ্মপরিবারের মধ্যে কবির আবির্ভাব। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মবাদ নিয়েই তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের সূত্রপাত। কবির বিচিত্র জীবনধারার মধ্যে তার কোনো নির্গলিত বাণী কি আমরা পাই ? পাই—সেই বাণী হচ্ছে এগিয়ে চলার বাণী—"আগে চল্ আগে চল্ ভাই।" কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। অতীতকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নি। অতীতের সঙ্গে আত্মিক যোগকে মেনে নিয়েই তিনি এগিয়ে চলেছিলেন।

বর্তমানকে কবি উপেক্ষা করেন নি—তার নিদর্শন রয়েছে তাঁর রাজনীতিক, সমাজনীতিক, আর্থনীতিক প্রবন্ধ ও পত্রধারার মধ্যে। দেশের বা বিদেশের কোনো অন্যায় অবিচারকে কবি নীরবে সহ্য করেন নি। তাঁর কবিহৃদয় আঘাত পেত, বেদনা অনুভব করত সমাজে তালভঙ্গ হলে। তাই তিনি নির্ভয়ে বলে যেতেন আপন কথা। অন্তরের অনুভূতি রূপ নিত কাব্যে, গানে, নাটকে।

অরসিক সমালোচকদের লেখনী থেকে এমন কথাও বের হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ এই সব পাঁচ-মেশালী কাজে মন না দিলে সাহিত্য আরও সম্পদবান হতে পারত। হয়তো হতো, কিন্তু তা এমন বিচিত্র রসে পরিপ্লুত হতো কিনা সন্দেহ। অতীতের সঙ্গে বর্তমান ও বর্তমানের সঙ্গে ভাবীকালের ভাবনার গঙ্গাধারা বইত না—তা এমন ভাবে বিশ্বপ্লাবী হতো না।

আফ্রিকার নবজাগৃতির পটভূমিকা

অংশু দত্ত

আফ্রিকা মহাদেশের সর্বত্র আজ যে অশান্ত আলোড়ন দেখা যাচ্ছে তার প্রকৃতি বুঝতে গেলে যেতে হবে এর পটভূমিকায়। অনুধাবন করতে হবে— আফ্রিকার সনাতন কৌমসমাজ কেমন ছিল, কিভাবে তার পরিবর্তন শুরু হলো, কী সেই পরিবর্তনের রূপ ও বৈশিষ্ট্য এবং সর্বশেষে সমাজদেহে এই বিরাট ওলটপালটের প্রভাব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কেমন করে ও কতদূর পর্যন্ত পড়েছে।

আফ্রিকার সাম্প্রতিক নবজাগৃতির দুটি দিক লক্ষণীয়: প্রথমত এতদিন পর্যন্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন যে সব কৌমসমাজ বেঁচে ছিল তাদের অনেকের বর্তমান ভগ্নদশা এবং দ্বিতীয়ত প্রাচীন সমাজের ভাঙনের পাশাপাশি এক নতুন সমাজের ভিত্তি-পত্তন।

স্বভাবত আফ্রিকার মতো বিশাল ও বৈচিত্র্যময় মহাদেশে প্রাচীন সমাজের অবক্ষয় ও নতুন সমাজের প্রস্থাপনের প্রক্রিয়া একহারে চলছে না। কোথাও এর গতি শ্লথ (যেমন মোজাম্বিক, দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা ও স্পেনীয় উপনিবেশসমূহ), কোথাও বা এর পদক্ষেপ দৃপ্ত (যেমন ঘানা, সেনেগাল প্রভৃতি দেশ)। এমন কি কোনো একটি দেশে যে পরিমাণে প্রাচীন সমাজের অবক্ষয় হচ্ছে সব সময় ঠিক সেই পরিমাণে যে নয়া সমাজ গড়ে উঠেছে, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কঙ্গোর কথা ধরা যাক। বেলজিয়ানরা আসার আগে দাসব্যবসায়ের বিভীষিকায়, লেওপোল্ডের নেতৃত্বে স্বাধীন কঙ্গো-রাজ্যের ('কঙ্গো ফ্রী স্টেট') আমলে কনসেশনভোগকারী কোম্পানীগুলির জুলুমে ও পরে মুদ্রাকেন্দ্রিক আধুনিক অর্থনীতির দাবিতে কঙ্গোদেশের একটা প্রধান অংশের পুরনো সমাজ প্রচুর আঘাত খেয়েছে। কিন্তু প্রাচীন সমাজদেহ যে পরিমাণে ছত্রভঙ্গ হয়েছে, ঠিক সেই পরিমাণে কি নতুন সমাজ গড়ে উঠেছে? নতুন সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য হলো পুরনো দিনের কৌমভিত্তিক সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে বৃহত্তর জনসমষ্টির মধ্যে সমবৈশিষ্ট্য-চেতনার উদ্ভব। সমগ্র কঙ্গোবাসীদের মানসে সমবৈশিষ্ট্যচেতনা যে খুব

গভীর শেকড় গাড়তে পারেনি, তার প্রমাণ তো স্পষ্ট। আর যতদিন না এই চেতনা দানা বেঁধে ওঠে ততদিন কোনো দেশ জাতিতে পরিণত হয় না। তাকে বড় জোর এক ভৌগোলিক নামই দেওয়া যায়।

আফ্রিকার দেশগুলিতে সমবৈশিষ্ট্যচেতনা বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। এর একেবারে প্রাথমিক স্তর হলো সেটি যখন একাধিক অনুরূপ কৌম তাদের ভাষা, আচার-ব্যবহার, ধর্ম বা সংস্কৃতির সাদৃশ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে এক সংগঠন গড়ে তোলে। উদাহরণস্বরূপ আমরা ট্যাঙ্গানাইকার চাগা কৌমসমূহের সাধারণ সংগঠনের উল্লেখ করতে পারি। আবার কখনও কখনও বহুদিন এক সরকারের সাধারণ আইন ও সাধারণ সাশনের অধীনে থাকার পর বিসদৃশ কৌমগুলির মধ্যেও সমবৈশিষ্ট্যচেতনা জেগে উঠতে পারে। আফ্রিকা বিভাজনের সময়ে ইওরোপীয় প্রতিযোগীরা নিজ নিজ অধিকৃত দেশগুলির রাজনৈতিক সীমারেখা নৃতত্ত্ব বা ভাষাতত্ত্বের মানদণ্ডে টানে নি। এর ফলে অনুরূপ এমনকি একই কৌমের লোকেরা অনেকসময় দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। পশ্চিম আফ্রিকার ইউই কৌমের লোকেরা তো ত্রিধাবিভক্ত হয়েছিল: তাদের এক অংশ পড়েছিল তৎকালীন বৃটিশ উপনিবেশ গোল্ডকোস্টে, অন্যভাগ বৃটিশ অছিরাজ্য টোগোল্যাণ্ডে ও তৃতীয় আর এক ভাগ যুক্ত হয়েছিল ফরাসী অছিরাজ্য টোগোল্যাণ্ডে। এইভাবে নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের সীমানার সঙ্গে রাজনৈতিক সীমানার গরমিল হওয়ায় অনেক দেশে একাধিক বিসদৃশ কৌমের সমাবেশ হয়েছিল। কিন্তু এমন পার্থক্য সত্ত্বেও দীর্ঘদিন একভাবে শাসিত হওয়ার ফলে অধিবাসীদের অন্তত একাংশের মনে জন্ম নিতে পারে এক আঞ্চলিক চেতনাবোধ। পূর্বতন বৃটিশ উপনিবেশ গোল্ডকোস্টে (বর্তমান ঘানা) বহু কৌমের বাস এবং তাদের কারো কারো মধ্যেকার (যেমন ফান্তি ও আশান্তি) শত্রুতা বহুদিনের। তা সত্ত্বেও ঘানার এক বৃহৎ অংশ সেখানকার সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে 'ঘানীয়' বোধ ও চেতনা জাগাবার জন্যে অত্যন্ত সচেতনভাবে যত্নবান।

আরো উচ্চস্তরে, একাধিক দেশ নিয়ে সমবৈশিষ্ট্যচেতনা জাগাবার চেষ্টা কোনো কোনো নেতৃস্থানীয় মহলে করা হচ্ছে। পূর্ব ও মধ্য-পূর্ব আফ্রিকার বৃটিশ-সাশিত দেশগুলির সমস্যা অনেকাংশে এক। তাদের অনুরূপ প্রয়োজন মেটাবার জন্য রয়েছে পূর্ব আফ্রিকা হাই কমিশন। সম্প্রতি কেউ কেউ এইসব দেশগুলি নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা বলেছেন।

সবশেষে সমগ্র মহাদেশের, এমনকি আফ্রিকার বাইরের নিগ্রোদেরও একাংশের মধ্যে জন্ম নিয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ হিসাবে সমবৈশিষ্ট্যচেতনা, যা বহু-বিঘোষিত প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের মানসিক বনিয়াদ। মার্কিন-নিগ্রো-নেতা দ্যু বোয়ার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেস, গার্ভের নেতৃত্বে পরিচালিত 'ফিরে চলো আফ্রিকায়' আন্দোলন ও গত কয়েক বছরের সরকারী বেসরকারী বহু সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এই প্যান-আফ্রিকান মনোভাবের কিছুটা পরিচয় আমরা পেয়েছি।

মোদ্দা কথা তাহলে এই দাঁড়ায়, নয়া সমাজের বাহকস্তম্ভ হলো সঙ্কীর্ণ কৌমগণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহত্তর জনসমষ্টি সম্পর্কে মমত্ববোধ ও সমবৈশিষ্ট্যচেতনা—যা আমাদের এক দেশ, এক সরকারের অধীনে বাস করতে ও এক আদর্শের রূপায়নে সংগ্রাম করতে প্রেরণা যোগায়।

অবশ্য কোনো সমাজের বিশেষ বিশেষ অংশে এক এক ধরণের চেতনার স্তর থাকা সম্ভব। যেমন, অশিক্ষিত ও রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে অনগ্রসর লোকেরা স্বকীয় কৌমবন্ধনকে সবার ওপরে স্থান দিতে পারে, 'আলোকপ্রাপ্ত' অংশ হয়তো বহুকৌমভিত্তিক রাষ্ট্রগড়ার স্বপ্ন দেখছে। তাছাড়া, একই লোকের মধ্যে একাধিক সমবৈশিষ্ট্যচেতনার সহাবস্থান সম্ভব: নিজ কৌমের লোকদের সম্পর্কে এক ধরণের আবেগ ও প্রত্যয়, নিজশ্রেণী সম্বন্ধে আর এক ধরণের বোধ, স্বকীয় ধর্মের প্রতি হয়তো অন্যধরণের মমত্ব। এর মধ্যে ঠিক কোন্ সমবৈশিষ্ট্যচেতনাটি রাজনৈতিক আন্দোলন ও রাষ্ট্রগঠন ব্যাপারে অন্য চেতনাগুলির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে তা সাধারণভাবে বলা অসম্ভব। তবে এটুকু সুনিশ্চিত যে, এক-কৌমিক সমাজের ওপর ভিত্তি করে আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামো দাঁড়াতে পারে না; কারণ এক-কৌমিক সমাজের লোকবল, ধনবল ও বাহুবল বর্তমান জগতের কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।

সমবৈশিষ্ট্যচেতনার অসমান স্তর ছাড়া তার বিভিন্ন রূপের কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার। সমবৈশিষ্ট্যচেতনা ও পরশাসনবিরোধী মনোভাব ও প্রতিরোধ যে সব সময় পরিষ্কার রাজনৈতিক রূপ নেবে এমন কোনো কথা নেই। বহু ক্ষেত্রে সমবায় জাতীয় শিক্ষা এমন কি বিশেষ কোনো ধর্মীয় আন্দোলনের আড়ালে আফ্রিকার আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামী মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে (উদাহরণ: ট্যাঙ্গানাইকায় সমবায় আন্দোলন, ঘানায় জাতীয় শিক্ষা

আন্দোলনের প্রবর্তন, পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গোয় কিম্বাঙ্গু-প্রবর্তিত সংগ্রামমুখী নবধর্ম আন্দোলন)।

স্বভাবত সনাতন কৌমবন্ধন যতদিন অটুট থাকে, ততদিন বৃহত্তর সমাজের চেতনা জাগতে পারে না। অতএব এই অর্থে আমরা বলতে পারি, সনাতন কৌম সমাজের ভাঙনে নতুন সমাজের বীজ গুপ্ত আছে। এখন, এই প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ভেঙে যায় কেমন করে, সে কথায় আসা যাক।

দুই

ইওরোপীয় প্রভুত্ববিস্তার যেমন ভারতবর্ষের সনাতনী সমাজব্যবস্থায় সুদূর-প্রসারী পরিবর্তনের কারণ, আফ্রিকার দেশগুলিতেও তাই। এতদিন যেসব অঞ্চলের আধুনিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে কোনো পরিচয় ছিল না উনবিংশ শতাব্দীর শেষে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হলো বৃহদায়তন সাম্রাজ্যসমূহে, যাদের প্রাণকেন্দ্র ছিল ইওরোপে। অর্থাৎ এতদিন পর্যন্ত যেসব দেশ পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, তাদের বিচ্ছিন্নতা এবার শেষ হয়। এবং বলা বাহুল্য এর প্রভাব সনাতন কৌমসমাজে না পড়ে পারে নি।

অবশ্য, সর্বক্ষেত্রে কৌমসমাজের ধ্বংসসাধন ইওরোপীয় শাসন কর্তৃপক্ষের সচেতন ও সুপরিকল্পিত নীতি ছিল, একথা বলা যায় না। বরং, অনেক সময় (যেমন, ইদানীংকালে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের ইওরোপীয় শাসকেরা চেষ্টা করছেন) কর্তৃপক্ষ প্রয়াস পেয়েছে কৌমসমাজকে বাঁচিয়ে রাখবার। তবু সামগ্রিকভাবে ইওরোপীয় প্রভু কর্তৃক আধুনিক শাসনযন্ত্র স্থাপন, বাণিজ্য ও মুদ্রাকেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রসার ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইওরোপীয় ও এশীয় ঔপনিবেশিকদের বসতি স্থাপন পরোক্ষভাবে কৌমসমাজের ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছে।

নিরন্তর আন্তঃকৌম দ্বন্দ্ব বন্ধ করা হলো ইওরোপীয় শাসন স্থাপনের সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ এক ফল। এক কৌমের সঙ্গে অন্য কৌমের দ্বন্দ্ব ও কখনও কখনও রক্তাক্ত যুদ্ধ বন্ধ করে কৌমের সাধারণ লোকের কাছে কৌমপ্রধানকে ছোট করা হয়েছে। যুদ্ধ পরিচালনা বহুক্ষেত্রে কৌমপ্রধানের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল। ইওরোপীয় শাসন বলপ্রয়োগের ওপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে কৌমপ্রধানের পদমর্যাদা খর্ব করেছে। কৌমপ্রধানের অন্য বহু ক্ষমতাও ইওরোপীয় সরকারের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। আর বাকি

যে ক্ষমতা তাঁদের রাখতে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি তাঁরা প্রয়োগ করতে পারেন বিদেশী প্রভুদের অনুগত কর্মচারী হিসাবে। এককথায়, পূর্বে কৌমপ্রধান রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষমতা নিজপদে কেন্দ্রীভূত করে সমগ্র কৌমকে যেমনভাবে ঐক্যবদ্ধ রূপ দিতেন, ইওরোপীয় আমলে তা হবার আর উপায় নেই। অন্যনিরপেক্ষ শাসক হিসাবে কৌমপ্রধানদের অবলুপ্তি এক হিসেবে কৌমসমাজের আত্মসম্পূর্ণতার ধ্বংসের সূচক।

ইওরোপীয় শাসনপ্রতিষ্ঠার আনুষঙ্গিক অন্য একটি ব্যাপার হলো নতুন রকমের কর স্থাপন। কৌমশাসনে কৌমপ্রধানকে হরেক রকমের ভেট ও উপহার দেবার প্রথা আফ্রিকার সমাজগুলিতে প্রচলিত ছিল। ইওরোপীয় শাসকেরা এসে যে করটির প্রবর্তন করলেন তা পণ্যের বদলে মুদ্রায় দেয়। আধুনিক শাসন চালাবার জন্যে কর হিসাবে প্রদত্ত এই অর্থ যে অতিপ্রয়োজনীয় সেকথা অনস্বীকার্য। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে এই, বহুক্ষেত্রে রাজভাণ্ডারের আয়ের চেয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ কারণে এই মুদ্রাকর বসানো হয়। কর দেবার জন্য আফ্রিকানদের প্রয়োজন টাকার। এবং সে-টাকা উপার্জন করা যায়: (ক) যাদের হাতে টাকা আছে সেই ইওরোপীয়দের জন্য কাজ করে; কিংবা (খ) বাজারে বিক্রি করে টাকা পাওয়া যায় এমন ফসল উৎপাদন করে।

প্রথমটার পরিণতি হয়েছে কৌমসমাজ থেকে দলে দলে আফ্রিকানদের শহরাঞ্চলে খনি-এলাকা ও বাগিচায় গমনে। একথা সত্য যে এমনভাবে যারা গেছে তাদের এক ভগ্নাংশ মাত্র চিরকালের জন্য গাঁ-ছাড়া হয়েছে। অর্থাৎ, বেশিরভাগই কিছুদিনের জন্য "টাকা কিনতে" বাইরে গেছে, তারপর গাঁয়ে ফিরে এসেছে, পরে আবার বাইরে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ঘর-বাহির' করার এক দৃষ্টান্ত মিলবে 'কাইসকামাহুক' গ্রাম্য সমীক্ষায়:

নাম: সমীক্ষায় নাম দেওয়া হয় নি।

নারী না পুরুষ: পুরুষ।

জন্ম: ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ।

শিক্ষা: প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত।

প্রথম কবে কাজ করতে গ্রামের বাইরে যায়: ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে, যখন তার বয়েস ১৬ বছর।

ফেব্রুয়ারী, ১৯০৮ থেকে মার্চ, ১৯০৯: দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় জার্মান পশ্চিম আফ্রিকান রেলপথে কাজ করে।

মার্চ, ১৯০৯ থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯১১: বাড়িতে থাকে।

সেপ্টেম্বর, ১৯১১ থেকে এপ্রিল, ১৯১২: প্রিটোরিয়ায় খনিশ্রমিক।

এপ্রিল, ১৯১২ থেকে ডিসেম্বর, ১৯১২: বাড়িতে থাকে।

ডিসেম্বর, ১৯১২ থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯১৩: উইটওয়াটার্সর‍্যাণ্ডে খনিশ্রমিক।

সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ থেকে নভেম্বর, ১৯১৩: বাড়িতে থাকে।

নভেম্বর, ১৯১৩ থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯১৬: উইটওয়াটার্সর‍্যাণ্ডে খনিশ্রমিক।

সেপ্টেম্বর, ১৯১৬ থেকে মার্চ, ১৯১৭: বাড়িতে থাকে।

মার্চ, ১৯১৭ থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭: উইটওয়াটার্সর‍্যাণ্ডে খনিশ্রমিক।

সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ থেকে নভেম্বর, ১৯১৭: বাড়িতে থাকে।

নভেম্বর, ১৯১৭ থেকে নভেম্বর, ১৯১৯: উইটওয়াটার্সর‍্যাণ্ডে খনিশ্রমিক।

নভেম্বর, ১৯১৯ থেকে ফেব্রুয়ারি, ১৯২১: বাড়িতে থাকে—এই সময় তার বিবাহ হয়।

ফেব্রুয়ারি, ১৯২১ থেকে জুলাই, ১৯২১: কেপটাউনে গৃহস্থবাড়িতে চাকরের কাজ করে।

জুলাই, ১৯২১ থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯২৩: বাড়িতে থাকে।

সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ থেকে জুন, ১৯২৪: কেপটাউনে রাজমিস্ত্রীর কাজ করে।

জুন, ১৯২৪ থেকে নভেম্বর, ১৯২৪: বাড়িতে থাকে।

নভেম্বর, ১৯২৪ থেকে নভেম্বর, ১৯২৫: কেপটাউনে মডেল ডেয়ারীতে দুধ বিলি করার কাজ করে।

নভেম্বর, ১৯২৫ থেকে ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮: বাড়িতে থাকে।

ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮ থেকে নভেম্বর, ১৯৩০: বেনোনির ইস্পাত কারখানায় কাজ করে।

নভেম্বর, ১৯৩০ থেকে অক্টোবর, ১৯৩১: জোহানেসবার্গে এক ইলেকট্রিক কোম্পানিতে কাজ করে।

অক্টোবর, ১৯৩১ থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২: জোহানেসবার্গে গৃহস্থবাড়িতে চাকরের কাজ করে।

সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ থেকে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭: বাড়িতে থাকে।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭ থেকে মার্চ, ১৯৩৮: উইটওয়াটার্সর‍্যাণ্ডে খনিশ্রমিক।

মার্চ, ১৯৩৮ থেকে নভেম্বর, ১৯৩৯: বাড়িতে থাকে।

নভেম্বর, ১৯৩৯ থেকে মে, ১৯৪০: উইটওয়াটার্সর‍্যাণ্ডে খনিশ্রমিক।

মে, ১৯৪০ থেকে নভেম্বর, ১৯৪৩ : জোহানেসবার্গে খনিশ্রমিক।
নভেম্বর, ১৯৪৩ থেকে মে, ১৯৪৫ : বাড়িতে থাকে।
মে, ১৯৪৫ থেকে নভেম্বর, ১৯৪৫ : উইটওয়াটার্সর‍্যাণ্ডে খনিশ্রমিক।
নভেম্বর, ১৯৪৫ থেকে আজ পর্যন্ত : বাড়িতে আছে।

অজ্ঞাতনামা এই আফ্রিকান ১৬ থেকে ৫৩ বছর পর্যন্ত শ্রমিক হিসাবে কাজ করেছে। ৩৭ বছরের কর্মজীবনে সে রেলপথ ও খনিশ্রমিক, গৃহস্থবাড়ির ভৃত্য, রাজমিস্ত্রী, দুধ সরবরাহকারী, ইস্পাত কারখানার মিস্ত্রী, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী প্রভৃতি অনেক রূপে ছ-টি বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হয়েছে। তেরোবার সে বাইরে গেছে আর বাড়ি ফিরেছে এবং সবশুদ্ধ ষোলবার চাকরী বদলিয়েছে।

'কাইসকামাহক' সার্ভের কর্তারা মন্তব্য করেছেন : এই শ্রমিকটির জীবনেতিহাস সাধারণভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমিকদের কর্মে অস্থায়িত্বের এক যথোপযুক্ত দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। এর ফলে নগরগামী শ্রমিকরা স্থায়ীভাবে শহরের বাসিন্দা হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু এই আসা-যাওয়ার ফলে যে তার কৌমবন্ধন অংশত শিথিল হয়ে পড়ে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

যতই দিন যাচ্ছে, ততই ক্রমশ বেশি সংখ্যায় আফ্রিকানরা শহরের দিকে ছুটছে। হিসেব করে দেখা গেছে ১৯২১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের আফ্রিকান অধিবাসীদের মাত্র ১৩% শহরাঞ্চলে বাস করত। ১৯৫০ সালে এই অনুপাত বেড়ে হয় ২৫%। বাসুতোল্যাণ্ডের মোট সাতলক্ষ অধিবাসীর একলক্ষ লোক সব সময়ই দক্ষিণ আফ্রিকায় খনি, শিল্প ও বাগিচায় কর্মব্যস্ত থাকে। ডেভিডসনের সংখ্যানুযায়ী ১৯৫৩ সালে তৎকালীন বেলজিয়ান কঙ্গোর আফ্রিকান অধিবাসীদের এক-চতুর্থাংশ কৌম এলাকার বাইরে বাস করত, যেখানে ১৯৪৬ সালে এই অনুপাত ছিল এক-ষষ্ঠাংশ।

উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় আফ্রিকানদের শহরবাসের তাৎপর্য কী? প্রথমত কৌমসমাজের বাইরে যারা যায়, তারা নতুন নতুন লোকের নতুন নতুন সমাজের সংস্পর্শে আসে। ফলে, অন্তত কিছু পরিমাণে তাদের মানসিক সঙ্কীর্ণতা দূর হয়। শহরে গিয়ে চটকদার ভোগ্যবস্তুর সন্ধান পেয়ে এদের অনেকে কর দেবার জন্য যেটুকু প্রয়োজনীয় তারও অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনে সচেষ্ট হতে পারে। এর জন্যে প্রয়োজন হয় আরও বেশিদিন ধরে কৌম সমাজের বাইরে কাজ করা। এদের দৃষ্টান্ত অনেককে প্রেরণা যোগায়।

এমনি করে ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় লোকের সনাতনী কৌম-অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীলতা কমে যায়।

অন্যদিকে কৌমসমাজ থেকে দলে দলে লোক অন্যত্র চলে যাওয়ার দরুণ এতদিনকার প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ কৌম-অর্থনীতি ভীষণভাবে আঘাত খেয়েছে। এ পর্যন্ত কৌমসমাজের প্রয়োজনীয় পণ্যের মোটামুটি উৎপাদন হতো কৌম-সমাজের ভেতরেই। এখন এতগুলি শক্ত, সমর্থ লোকের কৌমসমাজত্যাগের ফলে খাদ্যোৎপাদনের কাজ ব্যাহত হয় এবং অনেকক্ষেত্রে বাইরে থেকে খাদ্য আমদানীর ওপর কৌমসমাজকে নির্ভর করতে হয়। স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির বিনাশ কৌমসমাজের ধ্বংস ঘনিয়ে আনে।

বহু লোকের সনাতন সমাজ ত্যাগের ফলেই শুধু কৌম-অর্থনীতিতে ভাঙন ধরে নি। আমরা আগে বলেছি অর্থোপার্জন করা যায় গ্রামে বসেই, অর্থকরী ফসল উৎপাদন করে। আফ্রিকার অনেক অঞ্চলে এমনি করে তুলো, কফি, তামাক, কোকো, চীনেবাদাম, এমনকি সাইসাল পর্যন্ত আফ্রিকান কৃষকেরা উৎপাদন করছে। এভাবে অর্থোপার্জনের জন্য গ্রাম ছেড়ে বাইরে যেতে হয় না (বিক্রয় উদ্দেশ্যে ছাড়া)। কিন্তু তাই বলে এর দ্বারা কৌম-অর্থনীতি যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এমন কথা বলব না। কারণ, পূর্বোক্ত ফসল-উৎপাদন, বাজারে বিক্রয় ও লব্ধ অর্থে প্রয়োজনীয় দ্রব্য (অনেক ক্ষেত্রে খাদ্যও) ক্রয় : এই সব কার্যকলাপ কৌমসমাজ ছাড়িয়ে সারা দেশব্যাপী যে অর্থনীতি-ব্যবস্থা সক্রিয় রয়েছে (এবং যার সঙ্গে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিরও যোগাযোগ আছে) তার অংশীভূত। অন্যভাবে বলা যায়, কৌম-অর্থনীতির স্বয়ংসম্পূর্ণতার পরিপন্থী হলো এই সব কার্যকলাপ।

আরো একটু এগিয়ে গিয়ে আমরা বলতে পারি, এই সব কার্যকলাপে বিশ্ব-অর্থনীতির সঙ্গে আফ্রিকার দেশসমূহের যোগসাধনই সূচিত। সামগ্রিকভাবে আফ্রিকা কতখানি বিশ্ব-অর্থনীতির অঙ্গীভূত হয়েছে তার ইঙ্গিত আমরা পাই দুটি হিসাব থেকে :

[ক] বিশেষ বিশেষ পণ্যের পৃথিবীর সামগ্রিক উৎপাদনের কতখানি আফ্রিকা নিয়ন্ত্রণ করে ও মোট বিশ্ববাণিজ্যে আফ্রিকার অংশ কতটা।
[খ] আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বিশ্ব-অর্থনীতির যোগসাধনের এক তুলনামূলক বিচার চলতে পারে কোথায় কতখানি বিদেশী মূলধন লগ্নী হয়েছে তার হিসাবে।

১৯৫০ সালে সারা পৃথিবীতে উৎপন্ন খনিজ দ্রব্যের ৫.৫%, কোকো উৎপাদনের ৫০% ও উদ্ভিজ্জ তেলের প্রায় ৮০% উৎপন্ন হয় আফ্রিকায়। খনিজদ্রব্যকে পৃথকভাবে ধরলে তার হিসাব দাঁড়ায় এই :

আফ্রিকায় উৎপন্ন কয়লা সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনের ১'৩%
" " বক্সাইট " " " ২'৫%
" " লৌহ " " " ২%
" " স্বর্ণ " " " ৩৮'৫%
" " হীরক " " " ৯৮%

বিশ্ববাণিজ্যে আফ্রিকার অংশ যৎসামান্য ও অন্যান্য মহাদেশের থেকে যে অনেক কম সেকথা অনুমান করা শক্ত নয়। ১৯২৯ সালে পৃথিবীর মোট বাণিজ্যের মাত্র ৪'৬% আফ্রিকার ভাগে ফেলা যেত। আজ আফ্রিকার সঙ্গে বহিবিশ্বের বাণিজ্য মূল্য ও পরিমাণে অনেক বাড়লেও, পূর্বোক্ত শতকরা হার বেড়েছে কিনা সন্দেহ। আফ্রিকার সঙ্গে বহিবিশ্বের বাণিজ্যের মূল্য ও পরিমাণ বেড়েছে একাধিক কারণে :

প্রথমত, আফ্রিকা মহাদেশে মুদ্রা-অর্থনীতি ও বিনিময়-ব্যবস্থা প্রসারের ফলে সেখানে বিদেশে রপ্তানীর জন্য পণ্যোৎপাদন ক্রমশ বাড়ছে। ভাষান্তরে, আফ্রিকা বিশ্বশ্রমবিভাজনের অংশীদার হচ্ছে। দ্বিতীয়ত লগ্নীকৃত বিদেশী মূলধনের সুদ দেবার জন্য রপ্তানী বাণিজ্য বাড়াতে হচ্ছে। কোনো ব্যক্তি-বিশেষের দিক থেকে দেখলে, অর্থোপার্জনের স্পৃহা ও প্রয়োজন দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে অর্থকরী ফসল উৎপাদন ও খনি-কারখানায় আফ্রিকানদের কর্মগ্রহণের প্রবণতা ক্রমবর্ধমান।

বিশ্ববাণিজ্যে আফ্রিকার অংশ ছাড়া, লগ্নীকৃত বিদেশী মূলধনের পরিমাণ দিয়ে আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বিশ্বঅর্থনীতির যোগসাধন কতটা হয়েছে তার এক তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। সাহারার দক্ষিণস্থিত আফ্রিকায় দেশী পুঁজিপতিশ্রেণী না থাকায় গোড়া থেকেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদেশী মূলধনের চাহিদা ছিল প্রচুর। এবং এর প্রধান নিয়োগক্ষেত্র ছিল খনি, রেলপথ ও বাগিচা। অধ্যাপক হার্বার্ট ফ্র্যাঙ্কেলের হিসাবানুযায়ী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছুদিন আগে আফ্রিকায় মোট লগ্নীকৃত বিদেশী মূলধনের পরিমাণ ছিল £১৩০ কোটি। এর প্রায় এক-চতুর্থাংশ নিয়োজিত হয় রেলপথ-নির্মাণে। অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্কেল মন্তব্য

করেছেন, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের বৃটিশ কর্তৃপক্ষ যে সব ঋণ করেছেন তার ৭৫% ছিল রেলপথ নির্মাণ, চালু রেলপথ আধুনিকীকরণ ও আনুষঙ্গিক কাজের জন্য। রেলপথ নির্মাণে সবচেয়ে বেশি খরচ করে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন (£১৬'৭ কোটি), তারপর পর্যায়ক্রমে পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গো (£৩'৮ কোটি), পূর্বতন ফরাসী সাম্রাজ্য (£৩'২ কোটি), রোডেশিয়া ও ন্যায়াসাল্যাণ্ড (£২'৬ কোটি), কেনিয়া-উগাণ্ডা (£২'৩ কোটি), নাইজেরিয়া (£২'০ কোটি), পর্তুগীজ সাম্রাজ্য (£২'২ কোটি)।

অবশ্য দেশের আয়তন ও লোকসংখ্যার অসমতার জন্য পূর্বোক্ত হিসেব থেকে সঠিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না। অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্কেল ওপরের দেশগুলির মাথাপিছু লগ্নীকৃত বিদেশী মূলধনের হিসেব দিয়েছেন :

দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন	£৫৫'৮
উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া	£৩৮'৪
তৎকালীন বেলজিয়ান কঙ্গো	£১৩'০০
পর্তুগীজ সাম্রাজ্য	£৯'৮
ট্যাঙ্গানাইকা, কেনিয়া ও উগাণ্ডা	£৮'১
তৎকালীন বৃটিশ পশ্চিম আফ্রিকা (অর্থাৎ সিয়েরালিওন, গ্যাম্বিয়া, ঘানা ও নাইজেরিয়া)	£৪'৮
তৎকালীন ফরাসী সাম্রাজ্য	£১'৩

শ্রীফ্র্যাঙ্কেল তাঁর তথ্য থেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন :

[ক] আফ্রিকায় লগ্নীকৃত বিদেশী মূলধনের একটা বৃহদংশ নিয়োজিত হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে (৪২'৮১%)। অতএব, দক্ষিণ আফ্রিকান অর্থনীতি যে মহাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

[খ] যে সব অঞ্চলে খনিজ দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে, সেখানেই বিদেশী মূলধনের বৃহত্তর অংশ গেছে, যথা, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন, উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া ও পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গো।

[গ] মোট লগ্নীকৃত মূলধনের মধ্যে সরকার-নিয়ন্ত্রিত মূলধনের অনুপাত ৪৪'৭২%। তৎকালীন বৃটিশ আফ্রিকান সাম্রাজ্যে এই অনুপাত ছিল ৩৭'৬৮%।

শ্রীফ্র্যাঙ্কেলের বই প্রকাশিত হয় তিন দশক আগে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

পরে আফ্রিকায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার খুব দ্রুত বেড়েছে। পরে ইংল্যাণ্ডের 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকার 'দি অ্যাফ্রিকান রেভলুশ্যন' নামক বিশেষ সংখ্যায় (১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮) হিসেব দেওয়া হয়েছে, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকান কিম্বার্লেতে প্রথম যখন হীরক আবিষ্কৃত হয় তখন থেকে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাহারার দক্ষিণে অবস্থিত আফ্রিকায় ৩০০০ কোটি টাকা নিয়োজিত হয়। কিন্তু যুদ্ধোত্তর একটি মাত্র দশকে (১৯৪৫/৪৬—১৯৫৫/৫৬) প্রায় ততখানি মূলধন আফ্রিকায় এসেছে। অবশ্য দেশনির্বাচনে যুদ্ধোত্তর কালেও পুঁজিপতিদের মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। 'ইকনমিষ্ট'-এর মতে, ১৯৪৭ সালের পর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে ১,০০০ কোটি টাকার বেশি মূলধন নিয়োজিত হয়েছে। পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গো এবং উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়ায় এর পরিমাণ হচ্ছে যথাক্রমে ১,০০০ কোটি ও ৫০০ কোটি টাকার কাছাকাছি।

এই মূলধনের এক বৃহদংশ গেছে ফরাসীরা যাকে বলে 'অঁ্যাফ্রাস্ত্র্যুকত্যুর' তার গঠনে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধুমাত্র তো কারখানা নির্মাণেই নয়। কারখানায় পণ্য উৎপাদন ও সে পণ্য বিক্রয়ের জন্য আরও অনেক আনুষঙ্গিক জিনিষ দরকার: রাস্তাঘাট, রেলপথ, বন্দর, শ্রমিকদের গৃহসংস্থান, এমনকি কারিগরী শিক্ষা পর্যন্ত। শিল্পায়নে এই সব দিকের গুরুত্ব বোঝাবার জন্য অনেক মহলে আজকাল 'অঁ্যাফ্রাস্ত্র্যুকত্যুর' বা 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার' কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গোয় ১৯৪৯ সালে গৃহীত দশবার্ষিকী যোজনায় ৪৪% অর্থ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পৃথক করে রাখা হয়। মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রের ১৫৫ কোটি টাকার যোজনায় এক-চতুর্থাংশ যায় একই খাতে। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে প্রথম ৭০০ কোটি টাকা রেলপথ উন্নয়ন ও প্রসারে ব্যয় করার কথা হয়। পরে প্রয়োজনের তুলনায় এই টাকা যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায় আরও ১১$\frac{১}{২}$ কোটি টাকা ব্যয় করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। কিছুদিন আগে, এর ওপর আরও ৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন আফ্রিকার দেশগুলির বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের পক্ষে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা তো স্পষ্ট। সঙ্কীর্ণ কৌমগণ্ডী ভেঙে ফেলার পক্ষে এ জিনিষ যেমন প্রয়োজনীয়, বৃহত্তর সমবৈশিষ্ট্য-চেতনার উন্মেষের পক্ষেও তেমন। অতএব, পরিবহন ব্যবস্থার প্রগতি প্রকারান্তরে নয়া সমাজ গঠনের সম্ভাবনা সূচিত করে।

বিদেশী মূলধন লগ্নীর অন্যতম ক্ষেত্র হলো সাইসাল, কফি, রাবার, তুলো, আখ ইত্যাদির বাগিচা। জলবায়ু ইওরোপীয় বসতির অনুকূল হওয়ায় পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার অনেকাংশে ইওরোপীয়রা স্থায়ীভাবে বসতি করেছে; বিরাট বিরাট জমি নিয়ে আধুনিক কায়দায় বহু মূলধন ঢেলে চাষাবাদ করছে। কেনিয়া, ট্যাঙ্গানাইকা, উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে অনাফ্রিকান বসতি দ্বারা এই সব দেশের প্রাচীন সমাজ নানাভাবে প্রভাবিত। এই প্রভাবের রাজনৈতিক দিকটা আমরা সবাই জানি। এখানে অন্য দিকের আলোচনায় আসা যাক।

ইওরোপীয় কৃষি মানেই হলো মুদ্রাব্যবস্থানির্ভর আধুনিক অর্থনীতি। ইওরোপীয় কৃষি আবাদযোগ্য জমির অনেকাংশ ও বহু আফ্রিকান শ্রমিককে এমন অর্থনীতির মধ্যে নিয়ে এসেছে। তাই পূর্বোক্ত দেশসমূহে সনাতন স্বয়ংসম্পূর্ণ কৌম-অর্থনীতির ভাঙনের পক্ষে সহায়ক হয়েছে ইওরোপীয় বসতি।

ওপরের বক্তব্য আমরা কোনও মূল্যবিচারের প্রশ্নে না গিয়েই পেশ করছি। ইওরোপীয় বসতি ভালো কি খারাপ সে বিচার করার প্রয়োজন এখানে নেই। স্পষ্টত, ইওরোপীয় বসতি আফ্রিকানদের অনেক দুঃখদুর্দশার কারণ। এবং হয়তো ইওরোপীয় বসতি ছাড়াও পূর্বোক্ত দেশসমূহে মুদ্রাকেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রসার অসম্ভব হতো না। কিন্তু ইতিহাসে কী না হলে কী হতে পারত এই ধরণের গবেষণা নিষ্ফল। কতকগুলি দেশে অনাফ্রিকান বসতি হয়েছে এটা ঐতিহাসিক সত্য এবং ইওরোপীয় বসতি মুদ্রাকেন্দ্রিক অর্থনীতির সম্প্রসারণ করেছে, এটাও ঐতিহাসিক ঘটনা।

ইওরোপীয় বসতি ও বাগিচার প্রসারে বহু দেশে আফ্রিকানদের জমি হস্তান্তরিত হয়েছে ইওরোপীয়দের কাছে। এই হস্তান্তর-প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা গেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে, সেখানে ৮০% এর-ও বেশি জমি থেকে আফ্রিকানরা বঞ্চিত। তার পরে আসে দক্ষিণ রোডেশিয়া (৪৯%), পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গো (৯%), কেনিয়া (৭%), এবং উত্তর রোডেশিয়া (৫% এর কিছু কম)।

ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকরা শুধু অনেক পরিমাণে জমিই নেয়নি। তারা দখল করেছে উর্বর ও অবস্থানের দিক থেকে সুবিধাজনক জমি। তার ফলে আফ্রিকান অঞ্চলে ভিড় বেড়েছে, অযত্ন ও যথেচ্ছ ব্যবহারে জমির উর্বরা শক্তি কমে গেছে এবং কৌমকৃষি দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে

সৃষ্টি হয়েছে এক ভূমিহীন শ্রেণীর, যার অস্তিত্ব কখনও আফ্রিকান সমাজে ছিল না। এই ভূমিচ্যুত আফ্রিকানরা ভীড় বাড়িয়েছে অন্য যেসব কৌম এখনও জমির মালিক তাদের এলাকায়, কিংবা গেছে শহরাঞ্চলে, অথবা ইওরোপীয় কৃষিক্ষেত্রে কৃষি-শ্রমিক হিসেবে। এদের দুঃখদুর্দশা ও তুলনায় ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকদের ধনপ্রাচুর্য প্রায়শই ভূমিচ্যুত আফ্রিকানদের করেছে সংগ্রামমুখী। জমিবঞ্চিত কিকিয়ুদের বিক্ষোভ যে মাউ মাউ আন্দোলনে বিস্ফোরিত হয় একথা তো সর্বস্বীকৃত।

ভূমিহীন গ্রামের লোকেরা শহরে গেছে জীবিকার্জনের তাগিদে। যারা ভূমিহীন নয়, তাদের অনেককেও কৌমসমাজ থেকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে কর দেবার জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টায়। তার ওপর অনেকে গেছে ভোগ্যবস্তুর আকর্ষণে। অর্থোপার্জন করে একটা সাইকেল কি একটা সেলাইকল কেনার অভীপ্সা অনেক যুবককে টেনে নিয়ে গেছে শহরের দিকে। এ ছাড়া শহরের অন্য আকর্ষণও আছে। কৌমসমাজে যারা বিদ্রোহী তাদের অনেকে শহরাঞ্চলে এসেছে কৌমনিয়ন্ত্রণমুক্ত হবার চেষ্টায়। কোনো কোনো অঞ্চলে শহরে হালচাল ও আদবকায়দা সামাজিক পদমর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। টমাস হজকিনের ভাষায় ('ন্যাশনালিজম ইন কলোনিয়্যাল আফ্রিকা'): অনেক যুবকের কাছে শহরে যাওয়াটা হলো সাবালকত্ব-প্রাপ্তির প্রাক্কালে কৃত আচার-অনুষ্ঠানের আধুনিক সংস্করণ। শহরে ছাপ না থাকলে কোনো যুবকের পক্ষে নারীর প্রেমলাভ শক্ত হতে পারে।

অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার পূর্বোক্ত কারণসমূহের মধ্যে দারিদ্র্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক শ্যাপেরা তাঁর 'মাইগ্র্যান্ট লেবার অ্যাণ্ড ট্রাইব্যাল লাইফ' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে কিছু তথ্যপ্রমাণ পরিবেশন করেছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার কোনো শহরে ২৯১ জন আফ্রিকানকে গ্রাম ছেড়ে শহরে যাবার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে উত্তর পাওয়া যায় নিম্নরূপ :

১১৭ জন বলে তারা শহরে যায় কর দেবার অর্থসংগ্রহ করতে।
৮৩ " " " " " কর দেবার অর্থসংগ্রহ ও জামাকাপড় কেনার জন্য।
৩৯ " " " " " দারিদ্র্যের জন্য।
২৯ " " " " " জামাকাপড় কিনতে।

১৬ জন বলে তারা শহরে যায় জামাকাপড় ও গরুবাছুর কিনতে।
৫ " " " " " মা-বাপকে দিতে।
মাত্র ৬ " " " " " শহরের চটুল আকর্ষণে।

অধ্যাপক শ্যাপেরা অনুসন্ধান করে যা আবিষ্কার করেছেন মহাদেশের অন্যত্র তার কিছু ইতরবিশেষ হতে পারে। কিন্তু কমবেশি সর্বত্র সাধারণ এক প্রবণতা দেখা যায় যে প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই আফ্রিকানদের শহরমুখী অভিযান চলেছে। নাটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থবিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'দি অ্যাফ্রিকান ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার' নামক গ্রন্থের তথ্যেও তার সমর্থন মেলে।

কিন্তু উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, ফলপ্রাপ্তি এক। অর্থাৎ কৌমসমাজ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে, ফুঁ দিয়ে কোলানো বেলুনের মতো শহরগুলি ক্রমে স্ফীতাকৃতি ধারণ করছে এবং উত্তরোত্তর বেশি সংখ্যায় ও বেশি অনুপাতে লোক সনাতনী বদ্ধ কৌমগণ্ডী থেকে মুক্তির সুযোগ পাচ্ছে। এক কথায় গ্রামের লোকের শহরাভিমুখে যাত্রা দুটি জিনিষের সূচক : (ক) কৌম-সমাজের ভাঙন, ও (খ) কৌমনিরপেক্ষ বৃহত্তর সমাজ গঠনের সুযোগ। সুযোগ বলা হলো এই কারণে যে কোনো শহরের বিভিন্ন কৌম থেকে লোকেরা একত্রিত হলেই যে তারা সবাই মিলে বৃহত্তর সমাজ গঠন করবে, এমন কোনো কথা নেই।

বিভিন্ন দেশে শহরমুখী অভিযান কতখানি শক্তি অর্জন করেছে তার উত্তর মিলবে শহরগুলির বর্ধমান আয়তন ও লোকসংখ্যায় :

দাকার (সেনেগাল)	বামাকো (মালি)	বাঙ্গুই (মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র)
১৯১০ ... ২৪,৯১৪	১৯৪১ ... ২২,০০০	
১৯৩১ ... ৫৩,৯৮২		১৯৪৫ ... ২৫,০০০
১৯৫৫ ... ৩০০,০০০	১৯৫৫ ... ১০০,০০০	১৯৫৫ ... ১০০,০০০

লাগোস (নাইজেরিয়া)	লেওপোল্ডভিল (কঙ্গো)	এলিসাবেথভিল (কঙ্গো কাতাঙ্গা)
১৯১০ ... ৭৪,০০০	১৯৩৫ ... ২৬,৬২২	১৯৪০ ... ২৭,৭৮৯
১৯৩১ ... ১২৬,০০০	১৯৪০ ... ৪৬,৮৮৪	
১৯৫৫ ... ২৭০,০০০	১৯৫৫ ... ৩৪০,০০০	১৯৫৫ ... ১২০,০০০

সাতটি দক্ষিণ রোডেশীয় শহরে আফ্রিকান পুরুষদের সংখ্যা ১৯৩৬ সালে ৪৫,[illegible] থেকে ১৯৫৬ সালে ১৯৮,৪৫২ হয়েছে, অর্থাৎ বিশ বছরে চার গুণেরও বেশি বেড়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের '১৯৫০ সাল থেকে আফ্রিকার অর্থনৈতিক সমীক্ষা' নামক রিপোর্টে বিভিন্ন দেশে শহরবাসী আফ্রিকানদের সংখ্যাবৃদ্ধির নিম্নোক্ত ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে :

দেশ	শহরবাসী আফ্রিকানরা সমগ্র জনসংখ্যার কত অংশ
পূর্বতন ফরাসী ক্যামেরুন্স	১৯৩৭ সালে ২·৪% থেকে ১৯৫৭ সালে ৫·৫%
পূর্বতন ফরাসী বিষুবরৈখিক আফ্রিকা	১৯৩৬ „ ১·৭% „ ১৯৫৬ „ ৪·৪%
পূর্বতন ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা	১৯৩৬ „ ১·১% „ ১৯৫৬ „ ৪·১%
ম্যাডাগাস্কার (বর্তমানে মালাগাসী প্রজাতন্ত্র)	১৯৩৬ „ ৩·৯% „ ১৯৫৬ „ ৫·৬%
পূর্বতন ফরাসী টোগোল্যাণ্ড	১৯৩৬ „ ১·৮% „ ১৯৫৬ „ ৩·৭%

সমগ্র অবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাহলে এই : প্রাক্-ইওরোপীয় যুগে আফ্রিকান কৌমসমাজ ছিল মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। ইওরোপীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে নানা কারণে কৌমসমাজে ভাঙন ধরেছে। মুদ্রাকেন্দ্রিক বিনিময় অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও ক্রমে সম্প্রসারিত হচ্ছে। উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় আফ্রিকানরা শহরের দিকে আসছে এবং এদের মধ্যে অনেকে কৌমপ্রভাবমুক্ত হচ্ছে। এমনিভাবে এক কৌমনিরপেক্ষ বৃহত্তর সমাজ-সত্তার চৈতন্যোদয়ের ভিত্তি ক্রমশ শেকড় গাড়ছে।

তিন

কোনো দেশের আফ্রিকানদের কৌমবন্ধন অতিক্রম করে সামগ্রিক ঐক্য-প্রতিষ্ঠার দিক থেকে পূর্বোক্ত কথাগুলি প্রাসঙ্গিক। কিন্তু ঐক্যপ্রতিষ্ঠার সুযোগ ছাড়া জনসাধারণের সংগ্রামমুখিতা এবং সংগ্রামকার্যকারিতাও আমাদের বিবেচ্য বিষয়। একই সঙ্গে আন্তঃকৌম ঐক্য ও জনসংগ্রামের সম্ভাবনা মেলে নয়া শ্রেণীবিন্যাসে। প্রাক্-ইওরোপীয় যুগে কৌমসমাজের অঙ্গবিন্যাস ছিল সহজ। বেশির ভাগ কৌমে একদিকে থাকতেন কৌমপ্রধান, অন্যদিকে সাধারণ মানুষ। বহুক্ষেত্রে কৌমপ্রধান হতেন একাধারে শাসক, বিচারক, রাজনৈতিক নেতা, আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় সেনাপতি, যাদুকর ও পুরোহিত।

কোনো কোনো কৌমে কৌমপ্রধান ছাড়া ও সব ব্যাপারে উপদেশ দেবার জন্য থাকতেন সম্মানিত বৃদ্ধের দল (এই ধরনের শাসনব্যবস্থাকে নাম দেওয়া হয়েছে জেরোন্টোক্রেসি বা বৃদ্ধতন্ত্র)। এককথায়, শ্রমবিভাগের সীমাবদ্ধ প্রয়োগ, উৎপাদনযন্ত্র ও পদ্ধতির পশ্চাৎপদতা এবং উদ্বৃত্ত সম্পদের অপ্রাচুর্যের জন্য সনাতনী কৌমসমাজে বহুশ্রেণীর উদ্ভব হতে পারে নি।

কিন্তু পূর্ববর্ণিত কারণে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। নয়া অর্থনীতির উপহার এসেছে নয়াশ্রেণীবিন্যাসের রূপ ধরে। বিস্তৃত জমি হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে কেনিয়ার মালভূমিতে জন্ম নিয়েছে একদল ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। কঙ্গো (পূর্বতন বেলজিয়ান), মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশে যেখানে খনি, কারখানা, বাগিচা ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নতিলাভ করেছে, সেখানে আবির্ভূত হয়েছে এক শহুরে শূন্যবিত্ত শ্রমিক শ্রেণী (মার্কসীয় পরিভাষায় প্রলেতারিয়েতের সবচেয়ে কাছাকাছি যারা আসে)। নাইজেরিয়া, ঘানা ও উগাণ্ডায় আফ্রিকানরা অর্থকরী কৃষির দিকে ঝুঁকেছে। নাইজেরিয়ায় উদ্ভিজ্জ তেলের রসদ, ঘানায় কোকো, উগাণ্ডায় তুলো প্রভৃতি অর্থকরী ফসল আফ্রিকান কৃষকেরা উৎপাদন করছে। এই ধরনের প্রচেষ্টার সাফল্যে এই সব দেশে উদ্ভব হয়েছে এক ভূমিবান সম্পন্ন কৃষকশ্রেণীর। কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে (যেমন কঙ্গো, ট্যাঙ্গানাইকার কোনো কোনো এলাকা) আফ্রিকানরা ব্যবসায় বাণিজ্যে পর্যন্ত হাত দিয়েছে। সর্বোপরি, অর্থনৈতিক প্রগতি ও শিক্ষার বিস্তার অনেক দেশে শিক্ষক, আইনজীবী, চিকিৎসক, কারিগর ও দক্ষ শ্রমিক, অফিস-আদালতের কর্মচারী প্রভৃতি উপশ্রেণীর সৃষ্টি করেছে যারা একত্রে এদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলে পরিচিত (সেনেগাল, ঘানা ও নাইজেরিয়া)।

কোনো একটি শ্রেণীর লোকেরা সাধারণত একটি কৌম থেকে আসে না, আসে বিভিন্ন কৌম থেকে। এক নিয়ম মেনে এক সঙ্গে কাজ করতে করতে, এক শোষণ ও অত্যাচারের শিকার হয়ে এবং একই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার ফলে এদের মধ্যে যোগাযোগ ও ভাবের আদানপ্রদান ঘটবে, এটা আশা করা যায়।

কিন্তু নবশ্রেণীবিন্যাস সংগ্রামমুখিতা ও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক

আন্দোলনের কার্যকরতা বাড়ায় কী ভাবে? নতুন পরিবেশে, অনাফ্রিকানদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে এবং কখনও কখনও কিছুটা লেখাপড়া শিখে এইসব নতুন শ্রেণীতে মিলিত জনগণ কৌমসমাজবদ্ধ জনসাধারণের চেয়ে অনেক সহজে রাজনৈতিক চেতনা লাভ করতে পারে। এই চৈতন্য শুধুমাত্র নিজেদের দারিদ্র্য, পশ্চাৎপদতা ও বিদেশীদের প্রভুত্ব সম্পর্কিত নয়, নিজেদের সম্ভাব্য শক্তি সম্বন্ধেও বটে। বিশেষ করে, পরিবহন ব্যবস্থা, গুরুত্বপূর্ণ কারখানা, বিদ্যুৎ কোম্পানী ইত্যাদির শ্রমিকদের আত্মবিশ্বাস জাগে যখন তারা উপলব্ধি করে দেশের অর্থনীতি ও শাসনযন্ত্র কতবেশি তাদের ওপর নির্ভরশীল; ভাষান্তরে, সুপরিকল্পিত ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হলে কত সহজে দেশের স্বাভাবিক জীবন অচল করে দেওয়া যায়। যত বেশি সংগঠিত হোক, যত আক্রমনাত্মক হয়ে উঠুক না কেন, বিশেষ কোনো কৌমের পক্ষে কি সারা দেশ অচল করে দেওয়া সম্ভব? এছাড়া নবোদ্ভূত শ্রেণীসমূহের নেতারা নিজেদের দাবিদাওয়া সম্বন্ধে আধুনিক কায়দায় প্রচার করতে জানেন; কখন সংগ্রাম করতে হয় বা সংগ্রামের হুমকি দিতে হয় পক্ষান্তরে কখন আপোস করতে হয়, সারা দেশ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির খবর রাখেন বলে, সে সব কথা তাঁদের পক্ষে বোঝা সহজ হয়।

তাই আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে যখন শ্রেণী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায়, তখন আমরা আশ্চর্যবোধ করি না। কোৎ দিহ্বোয়ার-এ (হস্তিদন্ত উপকূল) 'স্যাঁদিকা আগ্রিকোল আফ্রিক্যাঁ' ও উগাণ্ডায় 'আফ্রিকান ফার্মাস ইউনিয়ন' নামে কৃষকপ্রতিষ্ঠানদ্বয় নিজ নিজ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছে। নাইজেরিয়া, ঘানা ও কোনো কোনো পূর্বতন ফরাসী উপনিবেশে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর ছাত্র যুবকেরা আন্দোলনের একস্তরে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছে।

শিল্পায়ন সীমাবদ্ধ হওয়ায়, সংখ্যার দিক থেকে শ্রমিকশ্রেণী দু-একটি দেশ ছাড়া কোথাওই উল্লেখযোগ্য নয়। শ্রীটমাস হজকিন তাঁর 'ন্যাশনালিজম ইন কলোনিয়্যাল আফ্রিকা' নামক গ্রন্থে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে শ্রমিক-শ্রেণীর যে আয়তন উল্লেখ করেছেন তার হিসেব আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি।

দেশ	শ্রমিকদের সংখ্যা	সমগ্র জনসংখ্যার কত অংশ	শ্রমিক ইউনিয়ন সমূহের সভ্যসংখ্যা
পশ্চিম আফ্রিকা ভূতপূর্ব ফরাসী	৩,৫০,০০০	২·০%	৭০,০০০
ভূতপূর্ব ফরাসী বিষুবরৈখিক আফ্রিকা	১,৯০,০০০	৪·২%	১০,০০০
ক্যামেরুন প্রজাতন্ত্র	১,২৫,০০০	৪·০%	৩৫,০০০
নাইজেরিয়া ও পূর্বতন বৃটিশ ক্যামেরুন্স—	৫,০০,০০০	১·৫%	১,৫০,০০০
ঘানা	২,০০,০০০	৪·৫%	২৫,০০০
সিয়েরা লিওন	৮০,০০০	৪·০%	২০,০০০
গ্যাম্বিয়া	৫,০০০	২·৫%	১,৫০০
কঙ্গো ও রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি	১০,০০,০০০	৮·৫%	৬,০০০
উগাণ্ডা	২,৮০,০০০	৪·০%	১,৫০০
কেনিয়া	৫,৫০,০০০	৮·০%	৩২,০০০
ট্যাঙ্গানাইকা	৪,০০,০০০	৬·০%	৪০০
ভূতপূর্ব বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড	২,০০০	০·৩%	×
ভূতপূর্ব ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড	২৫,০০০	২·০%	৩,৭০০
জাঞ্জিবার	৫,০০০	৪·০%	৯০০
উত্তর রোডেশিয়া	২,৫০,০০০	১৩·০%	৫০,০০০
দক্ষিণ রোডেশিয়া	৫,৩০,০০০	২৪·০%	×
নায়াসাল্যাণ্ড	১,২০,০০০	৫·০%	১,০০০
সুদান (পূর্বতন ইঙ্গ-মিশরীয়)	২,০০,০০০	২·০%	১,০০,০০০

শ্রী হজকিনের হিসাবমতো এই শতাব্দীর মাঝামাঝি (কোন্ বছরের হিসাব উল্লেখ না করলেও হজকিন যেসব পত্রপত্রিকা ও রিপোর্ট ভিত্তি করে পূর্বোক্ত হিসাব দিয়েছেন, সেগুলি থেকে মনে হয় তাঁর হিসাব ১৯৫০-১৯৫৩ সালের) তৎকালীন ঔপনিবেশিক আফ্রিকায় শ্রমজীবীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ মাত্র। এর মধ্যে একটা বৃহৎ অংশ যে স্থায়ী শ্রমিক বনে যায় নি, সেকথা আমরা আগেই বলেছি।

শ্রমজীবীদের সংখ্যাল্পতা ও অস্থায়িত্ব ছাড়াও উল্লেখ করতে হয় যে অনেক দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কর্তৃপক্ষের সুনজরে ছিল না এবং কোনো কোনো সরকার শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন বেআইনী ঘোষণা করে। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের লোকদের মিশ্র ইউনিয়ন গঠন নিষিদ্ধ, অথচ আফ্রিকান শ্রমিকদের ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রি করা হয়.না। দক্ষিণ

রোডেশীয় সরকার বরাবর আফ্রিকান শ্রমিক ইউনিয়নকে বিষদৃষ্টিতে দেখেছে। পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গোতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়ন গঠন আইন সম্মত ছিল না। সে বছর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলেও নিয়ম করা হয় যে প্রতি ইউনিয়নের সভায় জনৈক রাজকর্মচারী উপস্থিত থাকবে। এই নিয়মের ফলে সেখানকার শ্রমিক সংস্থাগুলি স্বাধীনভাবে বাড়তে পারে নি।

কিন্তু এতসব অসুবিধা সত্ত্বেও অধিকাংশ আফ্রিকান দেশে শ্রমিক আন্দোলন রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামে প্রত্যক্ষ সমর্থন জুগিয়েছে। ১৯৩৭ সালে ফ্রান্সের 'ফ্রঁ পপ্যুলেয়ার' সরকারের আমলে ফরাসী আফ্রিকান সাম্রাজ্যে সর্বপ্রথম আইনসঙ্গত শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয়। ভিশি আমলে কিছুদিন মন্দা পড়ার পর যুদ্ধোত্তর কালে আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশগুলিতে শ্রমিক আন্দোলন আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গিনিতে শ্রীসেকু তুরে-র ক্ষমতাপ্রাপ্তি শ্রমিক নেতা হিসাবে। ক্যামেরুন প্রজাতন্ত্রে অধুনা নিষিদ্ধ 'য়্যুনিওঁ দে পপ্যুলাসিওঁ' কামেরুনেজ্-এর (ইউ. পি. সি.) অন্যতম প্রধান সহায় ছিল জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন। অন্যান্য দেশের মধ্যে বেলজিয়ান কঙ্গোয় সংগ্রামী রাজনৈতিক আন্দোলনের শুরু হয় বেকার শ্রমিকদের বিক্ষোভে। কেনিয়ায় ১৯৫২ সালে ঘোষিত 'জরুরী অবস্থা'র শুরু হয় ১৯৫০ সালের সাধারণ ধর্মঘট থেকে। পরবর্তীকালে সেখানকার অন্যতম নেতা শ্রীটম এম্বোয়া শ্রমিক সংগঠক হিসেবে নিজের প্রভাব বিস্তার করেন। উত্তর রোডেশিয়ার 'তাম্র এলাকায়' ১৯৩৫, ১৯৪০, ১৯৫২, ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালের শ্রমিক ধর্মঘট আফ্রিকানদের সংগ্রামাত্মক চেতনার পরিচায়ক। নাইজেরিয়ায় স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের অবতারণা হয়েছে শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। ১৯৪৫ সালের সাধারণ ধর্মঘট, ১৯৪৯ সালে এনুগু শহরে খনিশ্রমিকদের ওপর গুলি-চালনা ও তার প্রতিবাদে সাধারণ ধর্মঘট এবং পরের বছর ইউনাইটেড আফ্রিকা কোম্পানীর বিরুদ্ধে সফল ধর্মঘট তার সাক্ষ্য দেয়। ঘানার সাধারণ নির্বাচনে শ্রীনক্রুমার কনভেনশন পিপল্‌স্ পার্টির জয়লাভে অনেকখানি সহায়তা করে ১৯৫০-এর সাধারণ ধর্মঘটকে।

কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন ছাড়া, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও যুব প্রতিষ্ঠানগুলি আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামে যে উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছে, সেকথা আমরা আগে বলেছি। সম্প্রতিকালের নেতাদের বেশির ভাগ এসেছেন এই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ও বিভিন্ন পেশা থেকে। ঘানার শ্রীনক্রুমা

লেখাপড়া করেছেন মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে। নাইজেরিয়ার বর্তমান গভর্নর জেনারেল শ্রীআজিকিওয়ে-ও ('জিক' নামে খ্যাত) শিক্ষা পেয়েছেন আমেরিকায়। তিনি একাধারে সাংবাদিক, লেখক ও পেশাদারী রাজনৈতিক নেতা। কঙ্গোর লুমুম্বা ছিলেন সরকারী কর্মচারী। নায়াসাল্যাণ্ডের হেষ্টিংস বান্ডা পেশায় চিকিৎসক। ট্যাঙ্গানাইকার জুলিয়াস নিয়েরেরে এক মিশনারী স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। কেনিয়ার জোমো কেনিয়াট্টা লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স এর ছাত্র।

মুক্তি সংগ্রামের এই সব নেতাদের প্রেরণার উৎস কোথায়? কোন্ আদর্শে তাঁরা উদ্বুদ্ধ? প্রধানত ইংরাজী ও ফরাসী ভাষার মাধ্যমে বাইরের পৃথিবীর বহুবিচিত্র ভাবাদর্শ তাঁদের নাগালের মধ্যে এসেছে। ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, মিশর ও প্যান-ইশ্লামিক বন্ধন, সমাজতন্ত্র, পশ্চিমী গণতন্ত্র—এইসব আদর্শের কিছু না কিছু প্রভাব সংগ্রামী নেতৃত্বের অংশবিশেষে কোনো না কোনো সময়ে পড়ে। নতুন আফ্রিকার নেতাদের জীবনী তার অজস্র প্রমাণ দেবে।

চার

সমস্ত ব্যাপারটা তাহলে এই দাঁড়াল। আফ্রিকার রাজনৈতিক চৈতন্যোদয়কে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন থেকে পৃথক করে দেখা যায় না। ইওরোপীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর আফ্রিকান দেশসমূহে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এসেছে। এইসব পরিবর্তনের ফলে একদিকে সনাতন কৌম সমাজের ভাঙন এবং অন্যদিকে বহুকৌমভিত্তিক নবশ্রেণী বিন্যাসের জন্ম সূচিত হচ্ছে। তাই সঙ্কীর্ণ কৌমগণ্ডী অতিক্রম করে বৃহত্তর-সমাজচেতনা বিকাশের সুযোগও ক্রমশ মিলছে।

উন্নতস্তরে গিয়ে এই চৈতন্যের পরিণতি হয় জাতীয়তাবোধে। বৃহত্তর সমাজচেতনার সংগ্রামে রূপায়ন ও সেই সংগ্রামের নেতৃত্বে নবোদ্ভূত শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও স্বাধীন বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। আফ্রিকার বিভিন্ন নেতার এইসব শ্রেণীতে জন্ম এবং এইসব শ্রেণীর নেতা হিসেবে তাঁদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার পূর্বোক্ত অবদানের অন্যতম লক্ষণ।

আমাদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ

অশোক রুদ্র

দু দুটো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পিছনে ফেলে আসা গেছে, তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বছরও কাবার হয়ে এল। দেশ স্বাধীন হয়েছে চৌদ্দ বছর হলো, সময়টা কম না। সেই ত্রেতা যুগে, যখন মানুষ শতশত বছর বাঁচত, তখনও এই চৌদ্দ বছরের মধ্যেই অরণ্যকাণ্ড লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত হয়ে সীতার পুনরুদ্ধার পর্যন্ত সম্ভব হয়েছিল। কর্ষণজীবী সভ্যতাকে পরাস্ত করে তার উপর আকর্ষণজীবী সভ্যতার প্রতিষ্ঠাকে রবীন্দ্রনাথ সীতাহরণের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। আমাদের নয়াদিল্লীর বাল্মিকীরা তাঁদের সীতাহরণের পালায় কতদূর অগ্রসর হলেন? চৌদ্দ বছরে পালা শেষ করার প্রতিশ্রুতি তাঁরা দেন নি, তাঁরা আরও চৌদ্দ বছর সময় চেয়েছেন, ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তাঁদের আঁক কষা আছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে শুধু একটা জিনিসই বুঝে দেখবার চেষ্টা করব। গত দশ বছরের অভিজ্ঞতা এবং আগামী পনের বছরের প্রতিশ্রুতি—এই দুয়ে মিলে কি ধরনের সোনার লঙ্কার ছবি ১৯৭৫ সালের দিগন্তে অঙ্কিত হয়? সেখানেও কি সীতা আম্রকুঞ্জে ক্রন্দনরতা, নাকি কোনো স্বর্ণগবাক্ষে তার সুখী কল্যাণী মুখচ্ছবি শোভা পায়? তাছাড়া ঐ রাবণের প্রাসাদের কতটা সত্যি সোনা আর কতটাই বা নিতান্তই রাংতা?

সরকারী আঁক অনুসারে ১৯৬০ সালে ভারতীয়দের গড়পরতা আয় ছিল মাসে সাড়ে সাতাশ টাকা, অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী ও তিনটি ছেলেমেয়ের সংসারকে যদি একটি সাধারণ ভারতীয় পরিবারের প্রতিনিধিস্থানীয় বলে ধরা যায় তো তার গড়পড়তা মাসিক আয় ছিল ১৩৭'৫ টাকা। এই আঁকে ভুলচুক কতটা আছে তা নিয়ে আপাতত মাথা ঘামাব না; তেমনি আমেরিকা বা গ্রেট-ব্রিটেন বা সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনায় আমাদের জীবনমান ঠিক কতটা নিচে তার আলোচনাও পাড়ব না। এই তুলনায় সংখ্যাতাত্ত্বিক জটিলতা অনেক; তাছাড়া প্রয়োজনও নেই। আমাদের জীবনমানটা কোথায় তা নিশ্চয়ই আমরা হাড়ে হাড়ে জানি।

তৃতীয় পরিকল্পনাতে চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনা সম্পর্কেও অল্পবিস্তর কিছু আন্দাজ দেওয়া হয়েছে। তাতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, ১৯৭৫ সালের মধ্যে গড়পরতা জাতীয় আয়কে মাসিক ৪৪ টাকায় তোলা সম্ভব হবে। আপাতত ধরে নেওয়া যাক যে আঁকটা নির্ভুল, সত্যিই এতটা উন্নতি সম্ভব হবে। জীবনমানের মূল্যায়নে উন্নতি কতটা হবে তার অনুমান পাঠকের কল্পনাশক্তির উপরই ছেড়ে দেওয়া গেল। শুধু একটু স্মরণ করিয়ে দিই যে গড়পড়তার হিসেবে খেয়াল না রাখলে নানান রকম ভুল ধারণা হওয়া সম্ভব। যেমন জাতীয় আয়ের সবটাই কিছু সাধারণ পরিবারের হাতে আসছে না। তার মধ্যে কোম্পানীর মুনাফার অংশ আছে, আছে সেই অংশ যাকে কেটে সরকারী তহবিলে চালান করা হচ্ছে কর হিসেবে। এও স্মরণীয় যে অর্থনৈতিক বৈষম্য যতদূর জানা যায় কমছে না, বাড়ছে। ১৯৬০ সালেই বৈষম্য এতটা ছিল যে গড় যদিও ১৩৭'৫, দেশের শতকরা ৯০ ভাগ জনগণেরই পারিবারিক আয় ছিল মাত্র ৯২৲ আর সর্বোচ্চ ১০ ভাগের আয় ছিল ৪৫৫৲। নিম্নতম ১০ ভাগের পারিবারিক আয় ছিল ২৩৲। বৈষম্য যদি নাও বাড়ে তো ১৯৭৫ সালে নিম্নতম দশভাগের গড় আয় হবে ৩৫৲ আর উচ্চতম ১০ ভাগের ৬৯০৲। এতেও সব বলা হল না। ১৯৭৫ সালে জনসংখ্যা হবে ৬২ কোটি, নিম্নতম ১০ ভাগেও লোক থাকবে ৬ কোটির বেশি। তাদের মধ্যেও কি বৈষম্য থাকবে না? থাকবে বইকি। যদি আরও সূক্ষ্মতর বিভাজনে যাওয়া যায় তো দেখা যায় নিম্নতম শতকরা ১ ভাগ লোক, যাদের সংখ্যা হবে ৬২ লক্ষ, তাদের মাসিক পারিবারিক আয় হবে মাত্র মাসে ১৬৲। আর এজাতীয় সংখ্যা নিয়ে নাড়াচাড়ার প্রয়োজন দেখি না। সংক্ষেপে বলা যায় আজ থেকে পনের বছর পরেও মহানগরীর রাস্তার ফুটপাতে অর্ধনগ্ন ও রুগ্ন স্ত্রী পুরুষ ও শিশুদের শুয়ে থাকতে দেখা যাবে। বড় বড় প্রাসাদ এখন যত আছে তার চেয়ে অনেক বেশি হবে সন্দেহ নেই, তাদের চাকচিক্যও এখনকার চেয়ে অনেক বেশি থাকবে, কিন্তু তাদের আশেপাশে খড়কুটো ছালা ও টিনের তৈরী কুঁড়ের সংখ্যাও হ্রাস পাবে না। ঠিক আশেপাশে হয়তো নাও থাকতে পারে। দারিদ্র্যের যে কদর্য প্রকাশ এখন অনেক ভারতীয় নগরীর শোভার হানি ঘটায় তাকে হয়তো নগর পরিকল্পনার দৌলতে আড়াল করে ফেলা হবে। কিন্তু লোপ পাবে না।

কিন্তু পরিকল্পনাকারেরা শুধু যে জাতীয় আয়ের লক্ষ্য স্থাপন করেছেন

তাতো নয়, তাঁরা আরও বলেছেন যে এই পনের বছরের মধ্যে ভারত অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন অর্জ্জন করতে সমর্থ হবে। এখন তো আমাদের বিদেশ থেকে ধারকর্জ করে পুঁজিনিয়োগের কাজ চালাতে হচ্ছে। পনের বছরের মধ্যে আমাদের অর্থনীতিতে স্বয়ংক্রিয় গতি সঞ্চারিত হয়ে যাবে। ধারকর্জ করার দরকার পড়বে না। নিজেদের সামর্থ্যেই নিজেরা এগিয়ে চলব। বিদেশী মুদ্রা যদি কিছু আসে তো তাকে ভিক্ষা করে আনতে হবে না, সুদলাভের আকর্ষণে তা যেচে আসবে।

এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে এ প্রতিশ্রুতি ফাঁকা। জাতীয় আয়ের উন্নতির যে আঁক কষা হয়েছে তার মধ্যে সুবিধামত কিছু কিছু জিনিস ধরে নিয়ে এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তি তৈরি করা হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে হয় আমরা স্বাবলম্বী হব এবং আমাদের প্রগতির হারকে অনেক কমিয়ে আনব, নয় পরিকল্পিত হারে এগিয়ে যাব কিন্তু একই সঙ্গে বৈদেশিক কর্জে আকণ্ঠ ডুবে যাব। কি কি জিনিস সুবিধামত ধরা হয়েছে দেখা যাক। আঁকে দুটো জিনিস দরকার পড়ছে, এক হলো সঞ্চয়ের হার, আরেক হলো আয়বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজিনিয়োগের হার, যাকে ইংরিজিতে Incremental capital output ratio বলা হয়ে থাকে। সংক্ষেপে এই দ্বিতীয় হারটিকে আমরা ICOR বলে উল্লেখ করব, বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করে ভাষাকে ভারাক্রান্ত করব না। পরিকল্পনাকারেরা ধরে নিয়েছেন সঞ্চয়ের হার ১৯৬৫ সালে ১১·৫%এ, ১৯৭০ সালে ১৫·৫%এ, এবং ১৯৭৫ সালে ১৮·৫%এ পৌছুবে। আর ICOR সম্বন্ধে ধরা হয়েছে যে তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য তা হবে ২·৩, এবং চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় ৩·১ করে। এই দুইটি পর্যায়ের হার ব্যবহার করে দেখানো হয়েছে যে বৈদেশিক কর্জের প্রয়োজন চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনাতে তৃতীয় পরিকল্পনার স্তরেই নিবদ্ধ থাকবে। এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তটার যথার্থতা পরীক্ষা করতে তাহলে আমাদের হারগুলোর যথার্থতা পরীক্ষা করতে হয়। এই পরীক্ষাটা, বলাই বাহুল্য, স্বনির্ভর হতে পারে না, একে হতে হবে তুলনামূলক। আমাদেরই দেশের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা তথা অন্যান্য নানান দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যা বলা যায় তা এই যে সঞ্চয়ের হারকে খুব বেশি করে ধরা হয়েছে এবং ICORকে ধরা হয়েছে অত্যন্ত অস্বাভাবিক রকমের নিচুতে। ICOR যত কম হবে, একই পরিমাণ আয়বৃদ্ধির জন্য পুঁজির দরকার পড়বে ততই কম। অতএব

সঞ্চয়ের হারকে অতিরিক্ত করে ধরে নেওয়া এবং ICOR-এর জন্য অস্বাভাবিক রকমের কম সংখ্যা ধরা দুই দিক থেকে বৈদেশিক কর্জের প্রয়োজনকে কম করে দেখিয়েছে। ভারতবর্ষে সঞ্চয়ের হার পঞ্চম দশকের গোড়ায় ৫% ছিল মাত্র। দশবৎসরের পরিকল্পনার ফল হিসেবে সে হার ৮%-এ উঠেছে বলে দাবি করা হয়েছে সরকারী পক্ষ থেকে যদিও বেসরকারী কোনো কোনো মহল থেকে বলা হচ্ছে যে সঞ্চয়ের হার এরই মধ্যে ১০%-এ উপনীত হয়েছে। এই শেষোক্ত অনুমান সত্য প্রমাণিত হলেও সঞ্চয়ের হারের অধিকতর বৃদ্ধির জন্য যে লক্ষ্যস্থাপন করা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না। যে কোনো দেশেরই সঞ্চয়ের হার নির্ভর করে তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর, যে ব্যবস্থা আয় এবং বিশেষ করে তার উদ্‌বৃত্ত অংশের উৎপাদন তথা বণ্টনের বিন্যাসকে নির্দিষ্ট করে। এই উৎপাদন ও বণ্টনের বিন্যাস অবশ্য সঞ্চয়ের হারকে সম্পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট করে না, তারা সেই হারের একটা উচ্চতম মাত্রাকে বেঁধে দেয়। অবস্থা বিশেষে সঞ্চয়ের হার এই মাত্রার নিচে থাকতে পারে কিন্তু তা ছাড়িয়ে কখনও উঠতে পারে না। ভারতবর্ষের সঞ্চয়ের হারকে যদি ৫% থেকে ৮% অথবা ১০% এও তোলা সম্ভব হয়ে থাকে তো তাতে দুটো জিনিস প্রমাণ হয়। এক, গত দশবছরে দেশে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যেটুকু পরিবর্তন হয়েছে, তাতে সঞ্চয়ের হারের ঊর্ধ্বতন মাত্রাকে কিছু পরিমাণে তোলা গেছে ; দুই, শুরুতে যে সঞ্চয়ের হার ছিল তা তদানীন্তন ঊর্ধ্বতন মাত্রার নিচে ছিল। কিন্তু একথা কি ধরে নেওয়া যায় যে এখনও সেই মাত্রা এতই উঁচুতে রয়েছে যে আর পনেরো বছরের মধ্যে সঞ্চয়ের হার ১৯-২০%-এ পৌছুতে পারবে ? অন্যান্য দেশের দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখি যে সমাজতন্ত্রী দেশগুলির বাইরে খুব কম দেশেই সঞ্চয়ের হার এতটা উঁচুতে উঠতে পেরেছে। বাস্তবিক পক্ষে কেবলমাত্র জাপান, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানি ও অষ্ট্রেলিয়াই পেরেছে এতটা উঁচু হারে পৌছুতে। যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডার মতো উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশেও এই হার অনেক নিচুতে। সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে অবশ্য সঞ্চয়ের হার উঁচুতেই হয়ে থাকে. কিন্তু তাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা করে কোনো লাভ নেই। আগামী পনেরো বছরের মধ্যে এমন কোনো ব্যাপক পরিবর্তন কি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আশা করা যায় যা এই হারের ঊর্ধ্বতন মাত্রাকে এতটা উঁচুতে তুলতে পারবে ? কংগ্রেসী অর্থনীতির কাঠামোটা এই গত চোদ্দ বছরে তো বেশ পরিষ্কারভাবেই দানা বেঁধেছে।

কোনো মূলগত পরিবর্তনই তো কোনো ক্ষেত্রে হওয়ার বাকি নেই। তা সত্ত্বেও যেটুকু পরিবর্তন আশা করা যায় তা হল প্রথমত অর্থনীতির সরকারী বিভাগ বা পাবলিক সেকটারের সম্প্রসারণ এবং দ্বিতীয়ত কৃষিতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিয়ৎপরিমাণ প্রসার ও প্রতিষ্ঠা। এছাড়া বেসরকারী মহলের শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের জায়গায় যৌথ প্রতিষ্ঠানের আকার ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে আশা করা যায়। এই ত্রিবিধ পরিবর্তনই সঞ্চয়ের হারের উর্ধ্বতন মাত্রাকে উন্নত করবে সন্দেহ নেই এবং সেই প্রবণতাকে আরও বলবৎ করবে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি, কারণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অপরিবর্তিত রেখেও যদি জাতীয় আয়ের পরিমাণকে বাড়ানো হয় তো শুধু সেই কারণেই সঞ্চয়ের পরিমাণ কিছু পরিমাণে বাড়বে আশা করা যায়। এই সমস্ত কটি যুক্তি মেনে নেবার পরও সঞ্চয়ের হারের জন্য যে লক্ষ্যস্থাপন করা হয়েছে তাদের অত্যুচ্চ বলে মনে হয়। নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত অনুমানের কথাই যদি বলতে হয় তো বলব চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনার জন্য গড় হিসেবে সঞ্চয়ের হারকে ১২·৫% ও ১৫%-এর চেয়ে বেশি বলে ধরে নেওয়াতে ভুল করার সম্ভাবনা খুব বেশি থেকে যাবে।

ICOR সম্বন্ধে বলার কথা এই যে জাপান ও পশ্চিমের উন্নত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির দেশগুলিতে এই হারের পরিমাণ ৬ থেকে ১০ পর্যন্ত বিস্তৃত। এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত অর্থনীতির দেশগুলিতেও এই হার কদাচিৎ ৩-এর কম হয়, অনেক সময়ে তা ৪·৫% পর্যন্ত ওঠে। ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতাতেও দেখি, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই হার হয়েছিল ৩.৭%। এ প্রশ্নটা মনে না এসেই যায় না, ৩·৭%-এর থেকে এ হার তৃতীয় পরিকল্পনায় ২·৩%-এ নামানো হবে কি উপায়ে? নামানো যে যায় না এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সমাজব্যবস্থার, উৎপাদন পদ্ধতির এবং পরিকল্পনার কলাকৌশলে হয়তো এমন পরিবর্তন আনা চলতে পারেও বা যাতে করে ভারতবর্ষের তৃতীয় পরিকল্পনায় পুঁজিনিয়োগের ফলোৎপাদনকারী ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পাবে যার তুলনা অন্য কোনো দেশে কদাচিৎই মিলেছে। কিন্তু তাহলে তো অন্তত যে যে উপায়ে এই অসাধ্য সাধন ঘটানো হবে তাদের আবিষ্কার করতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনা ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা দুটো তন্ন তন্ন করে তুলনা করে দেখলেও এমন কোনো প্রকৃতিগত উন্নতিই প্রথমোক্তটিতে চোখে

পড়ে না যাতে এই জাতীয় আশাবাদিতা সমর্থিত হতে পারে। তাছাড়া আরও একটি কথা। কোনো অত্যন্ত বিচক্ষণ উপায়ে যদি বা পুঁজিনিয়োগকে এতটা ফলপ্রসূ করা যায়ই তো সে ক্ষমতাকে ধরে রাখা যাবে না কেন? চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনার জন্য ICORকে আবার উন্নত হতে দেওয়া হয়েছে কেন? এসব প্রশ্নের শুধু একটা জবাবই গ্রাহ্য এবং তা এই যে তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য যে ICORকে কম করে ধরা হয়েছে তা নিতান্তই সংখ্যাতাত্ত্বিক অসাধুতা—পুঁজিনিয়োগের এতটা ফলপ্রদ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনার ICOR দ্বিতীয় পরিকল্পনার চেয়ে কম হওয়ার কোনোই হেতু নেই।

একথা তাহলে জোর করেই বলা যায় যে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির জন্য যে লক্ষ্যস্থাপন করা হয়েছে তাতেও পৌছানর কোনো সম্ভাবনাই নেই যদি না আরও অনেক বেশি বৈদেশিক ঋণের সাহায্য না নেওয়া হয়। এই সম্পর্কে আমি নিজে সামান্য একটু আঁক কষেছি। এই আঁক নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সরল ও অগভীর, কিন্তু সরকারী পরিকল্পনাকারেরা যে আঁকের সাহায্যে তাঁদের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি স্থাপন করেছেন তার তুলনায় কিছু উপেক্ষণীয় নয়। যে সিদ্ধান্তে পৌছেছি তা অত্যন্ত লোমহর্ষক। দেখি যে জাতীয় আয়কে যদি সত্যি ১৯৭৫ সালে মাসিক গড়পরতা ৪৪ টাকায় উঠতে হয় তো আমাদের বৈদেশিক ঋণকে ১৮,০০০ কোটিতে পৌছুতে হবে! তৃতীয় পরিকল্পনার আঁক অনুসারে ১৯৬৫ সালে এই ঋণের পরিমাণ ৩,৫০০ কোটি মতো হওয়ার কথা। সাড়ে তিনহাজার কোটির ঋণ থেকে ১৮০০০ টাকার ঋণে পরিণত হয় যে উন্নয়নের পদ্ধতিতে তার মারফৎ অর্থনীতি স্বাবলম্বী হয়ে যাচ্ছে বলাটা খানিকটা মস্করার মত শোনায় নাকি?

বিকল্প আঁক অনুসারে দেখা যায়, যদি বৈদেশিক কর্জকে ১০,০০০ টাকার নিচে রাখতে হয় তো গড় মাসিক পারিবারিক আয়ের হার কম করে হলে ১০৫ টাকায় এবং বেশি করে হলে ২০০ টাকায় পৌছুতে পারবে মাত্র। এই তো গেল আয়ের হিসাব। অন্য একটা হিসাব করেও আমাদের ভবিষ্যৎ যে কতটা আশাহীন তার পরিমাপ পেতে পারি। সে হল বেকার সমস্যার আয়তন বিচার। একথা তো জানা যে আমাদের দেশে সমস্যাটা, এক শহুরে মধ্যবিত্তের বাইরে, চাকুরিহীনতার নয়, তা হল কর্মক্ষম বয়ঃপ্রাপ্ত জনসংখ্যার অনুপাতে অর্থকরী কর্মসুযোগের অভাবের। ফলে বেকার সমস্যার আয়তন

পরিমাপ একটা জটিল ব্যাপার, প্রায় সময়েই প্রশ্নোত্তরভিত্তিক অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় বেকারের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্যভাবে আসে। পরিকল্পনা-কারেরা বেকারের সংখ্যা না গুণে বেকারত্বের পরিমাপ করেন একদিকে কর্মক্ষম জনতার সংখ্যা রেখে এবং অপরদিকে সেই জনতার কতটা অংশকে পূর্ণমাত্রায় কর্মের সুযোগ দেওয়া যায় তার পরিমাণ রেখে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে দেখানো হয়েছে যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় উদ্বৃত্ত জনশক্তির পরিমাণ ছিল ৫৩ লক্ষ এবং তার অন্তে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯০ লক্ষে। ৫৩ লক্ষ সংখ্যাটি কতটা নির্ভরযোগ্য জানি না, মনে হয় অত্যন্ত বেশিরকম কম করে ধরা। কিন্তু আগের মতই আপাতত আমরা সরকারী তথ্য মেনেই চলব। প্রারম্ভিক বিন্দুর জন্য, দৃষ্টি নিবদ্ধ করব প্রগতির হার যা দেখানো হয়েছে তার উপর। তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচবছরে কর্মক্ষম জনসংখ্যা বাড়বে ১৭০ লক্ষ আর কর্মসুযোগ বাড়বে ধরা হচ্ছে ১৪০ লক্ষের আন্দাজে, ফলে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি বেড়ে ১২০ লক্ষে দাঁড়াবে। কিন্তু এখানেও আবার একটা সংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধাবাদিতা ধরা পড়ে যায়। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার অভিজ্ঞতায় দেখি, কর্মসুযোগ সৃষ্টির হার ছিল প্রতি ১১০০০ টাকা পুঁজিনিয়োগে একজনের কর্মসংস্থান। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার কালে যদি ১৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করতে হয় তো সে হারকে হতে হবে প্রতি ৮০০০ টাকা নিয়োগে একজনের কর্মসংস্থান। কি উপায়ে এই হারকে এতটা নিচে নামানো হবে তা কোথাও বলা নেই। অতএব, আবার আমাদের এই হারকে অগ্রাহ্য করতে হয়। একটু কম করে যদি ভবিষ্যতের জন্য হারটিকে কর্মসুযোগ প্রতি ১০,০০০ টাকা করেও ধরে নিই, ১৯৭৫ সালের মধ্যে যে নূতন কর্মসুযোগের সংযোজন আশা করা যায় তার সংখ্যা হল ৬৪০ লক্ষ, আর পরিকল্পনা অনুসারে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা একই কালে বাড়বে ৭ কোটি। ফলে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি ৯০ লক্ষ থেকে ১৫০ লক্ষে পরিণত হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পনের বছর পরেও, বৈদেশিক কর্জ এখনকার চেয়ে পাঁচগুণে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও, বেকার সমস্যার কোনোই কিনারা হবে না। কিন্তু বৈদেশিক কর্জকে যদি ১০,০০০ টাকার নিচে রাখা হয়, তাহলে একদিকে আয়বৃদ্ধি যেমন খুবই সামান্য হবে, অপরদিকে কর্মসুযোগের বৃদ্ধিও ৪·৫ কোটির বেশি হবে না, ফলে উদ্বৃত্ত জনশক্তির পরিমাণ ৩·৫ কোটিতে দাঁড়াবে।

নিত্যব্যবহার্য কিছু সামগ্রী এখনই বা গড়ে কতটা করে আমাদের

জোটে আর কতটা করেই বা আরও পনের বছর পরে জুটবে তার তুলনা করলে আমাদের জীবনমান কোথা থেকে কোথায় যাবে তার খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। চাল গম এবং অন্য খাদ্যশস্য এখন জোটে মাথাপিছু দৈনিক সাড়ে সাত ছটাক হিসেবে, ১৯৭৫ তা জুটবে পৌনে নয় ছটাক হিসেবে। তেল ঘি এখন জোটে মাসে ৭ ছটাক হিসেবে, পনের বছর তা জুটবে সাড়ে নয় ছটাক হিসেবে। চিনির হিসাব তথৈবচ। চা ও কফি এখন মাথাপিছু মাসে ১ আউন্স মতো করে মাত্র জোটে, তা বেড়ে ১·৩ আউন্স হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। কেরোসিন তেলের খরচ এখন মাথাপিছু মাসে মাত্র সাড়ে ছয় ছটাক, আরও তিনটি পরিকল্পনা পার হওয়ার পর তা নয় ছটাকে পরিণত হবে। বিদ্যুতের ব্যবহার এখন মাসে মাথাপিছু ৩০০ ওয়াট্, তা ৮০০তে পরিণত হবে বলে মনে হয়। লজ্জানিবারণ ও শীততাপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাধারণ একজন ভারতবাসীর গড় হিসেবে জোটে ১৬ গজ সুতির কাপড় বছরে, তার জায়গায় জুটবে ১৯ গজ করে। আর উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। মোটের উপর দেখা যাচ্ছে যে আমরা এখন যেমনটি আছি আরও পনের বছর পরেও মোটামুটি সেই রকমটিই থাকব। Alice in wonderland-এর alice বলে, "In our country, you'd genarally get to somewhere else—if you ran very fast." তার উত্তরে Red Queen বলে, "A slow sort of country ! now, here, you see, it takes all the running you can do, to keep in the same place." আমাদের অর্থনৈতিক প্রগতিটাও মনে হচ্ছে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার জন্য উর্ধ্বশ্বাসে ছোটা। কিন্তু এটুকু বললেই যথেষ্ট বলা হয় না। এটুকু বললে বলাটা নিতান্তই একপেশে হয়ে যায়। যে ধরনের মাপজোক নিয়ে হিসেবে নেমেছি তাতে যে প্রগতির প্রতিশ্রুতি আমাদের সামনে মেলা হয়েছে তা নগন্যই ঠেকে বটে। কিন্তু তাই বলে সমস্ত প্রগতিটাকেই তুচ্ছ মনে করে উড়িয়ে দিলে চরম আত্মবঞ্চনা করা হবে। দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে এই প্রগতির অন্য একটা দিকও ধরা পড়বে। তার আলোচনাটা এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশের জন্য মুলতুবী রাখা গেল।

জালের আড়ালে, রাজা

সিদ্ধেশ্বর সেন

জালের ওধারে সেই যে রাজা, নন্দিনী
পউষের মাঠের শিশির, তার নয়
পৃথিবীর সপ্রতিভ আলো, বন-প্রান্তরের যত হাওয়া,
সব জাগে

রঞ্জনের অগাধবিস্ময়

সমস্ত, সমস্ত বর্ণস্বাদগন্ধ ফিরে, ফিরে আসে
ও যে প্রেমিক, প্রেমিক

বিদ্রোহ তো তার, অনুরাগে

জটিলআড়াল, হায়, প্রাণপাত দেহ,—কে
লুটায়
মৃত্যুর পিছল হাত, খনিজ-কন্দর হ'তে হাত,—রাজা

রঞ্জনের পথে পথে তোমার চলার জ্বালা, ধনী

অগণ্য আড়ালে ধ্বস, ধ্বজা-
দণ্ড, সে ধুলায়
প্রতীক্ষায়প্রেমে অশঙ্কিণী

কেউ না, ও কে কাদের রাজা ॥

দ্রষ্টা

আলেক্‌সান্দর পুশ্‌কিন

তৃষার্ত হিয়া সুন্দর-সন্ধানে
ফিরিতেছিলাম মরুময় দেশে আমি,
এ-হেন সময়ে পথের প্রান্তখানে
দীপ্ত সে এক দেবদূত এলো নামি'।
হালকা হাতেই ছুঁলো সে আমার চোখ
রাত্রে যেমন নামে ঘুম আঁখিপাতে ঃ
অমনি সে-চোখে জাগে ভবিষ্যলোক
দ্রষ্টার চোখ লভি অনুকম্পাতে।
কান যেই ছুঁলো, ভরে গেল দুই কান
গানে-গর্জনে, তুমুল অট্টরবে ঃ
শুনি—আক্ষেপে শ্বসে' আকাশের প্রাণ
পাখার ঝাপট পরীদের দূর নভে,
শুনি—সমুদ্রতলে ঘোরে সরীসৃপ,
প্রাণরসে ভরে ওঠে-যে সরস শাখী।
মুখে ঝুঁকে পড়ে টেনে ছিঁড়ে লয় জিভ
দেবদূত সেই—রসনা পাপের পাখি—
ছিঁড়ে লয় যত মিথ্যা, অলস ভাষা,
অধরোষ্ঠের মাঝখানে দেয় মুছে
হৃতাশশ্বের দ্বিজিহ্ব-বিষনেশা,
রক্তে মাখানো হাত দেয় মুখে গুঁজে।

খোলা তরবারে চিরে সে আমার বুক
হৃৎপিণ্ডটা উপড়িয়ে করে বার,
মুক্ত-কপাট হাহা-করা সিন্দুক
ফের ভরে এক জলন্ত অঙ্গার।

কতকাল ছিনু প্রাণহীন, তারপর
দৈববাণীতে শুনিলাম কার স্বর:
"ওঠো, জাগো, তুমি শোনাও আমার বাণী,
আমার ইচ্ছা-তাড়িত হও না পার
সমুদ্র-মরু, হানো বাণী সন্ধানী—
মানবহৃদয় পুড়ে হোক ছারখার।"

তিন উৎস

আলেক্‌সান্দর পুশ্‌কিন

বিস্তৃত বিশাল এই পৃথিবীর ক্ষেত্রে সকরুণ
তিন রহস্যের নদী ফল্গু, প্রবাহিত;
একটি উৎস যৌবনের—ঝর্ণাধারা উন্মত্ত, দারুণ,
কল্লোলিত জল ছোটে ঝিকিমিকি, সিত;
অন্য উৎস কাস্তেলিয়া—উর্মিমালা দৈবী প্রেরণায়
সঙ্গীতে মাতায় মরু, চেতায় বন্দীকে;
সর্বশেষ উৎস যেবা, হৃদয়ের উৎক্ষেপ জুড়ায়,
সুশীতল বহে জল বিস্মৃতির দিকে।

আশা

মিহাইল লের্‌মন্‌তফ

নন্দনবনবিহারিনী মোর পাখি!
সারা দিনমান সাইপ্রিস-শাখে বসে
ছাখে দিবালোক উড়ে যায়, ছাখে নাকি?
সারাদিন তবু গান গায় নাকো ও-সে।
পিঠে ওর নভোনীলিমার আভালাগা.
উজ্জ্বল লাল মাথাটি ; আগুন-রঙা
দুটি ডানা, তায় সোনার আভাস জাগা—
আকাশ যেমন উষার আলোয় ভাঙা।
কেবল পৃথিবী নিঝুম যখন ঘুমে,
রাতের কুয়াশা গড়ায় ছড়ায় চুপে,
সে মাতে গোপনে সঙ্গীত-মরশুমে
নিখিলচিত্তহারিণী মোহিনী রূপে।
এমনই সে-স্বর, দুঃখ-নিগড় ভুলে
গলা দিতে হবে আমাকে-তোমাকে-তাকে,
ললিত রাগিনী প্রাণ বুকে রাখে তুলে—
যেমন পরম বন্ধু, ঘরে যে থাকে।
কতদিন ঝড়ঝঞ্ঝায় শুনেছি-যে
সেই গান, আহা, সে-গানে জীবন'সাধি,
আহা, পাখি মোরে শান্তি দিয়েছে কী-যে,
শুনি, গান শুনি, আশায় হৃদয় বাঁধি।

সম্মিলিত যাত্রা

ভ্লাদিমির মায়াকভ্‌স্কি

শহরে বাগান মাড়াও মাড়াও বিদ্রোহী পদভরে!
মাথা উঁচু রাখো! ফৌজী টুপিটা আকাশে দিক না লাফ!
দুনিয়ার মোরা দ্বিতীয় প্রলয়—ছড়াই বাইরে-ঘরে
পৃথিবীর প্রতি শহর আমরা ধুয়ে মুছে করি সাফ।
পায়ে পায়ে ছাঁটে নানারঙ-দিনগুলি।
বছর গড়ায় ধীরেসুস্থেই খুবই
গতি আমাদের ইষ্ট, যেন না ভুলি।
হৃৎপিণ্ডটা বাজে বুঝি দুন্দুভি।
আমাদের চেয়ে দামি সোনা কই. বলো তো হে যাদুকর?
বুলেটের হুলে বিষ কত আছে শুনি?
আমাদের এই গান হতে কোন্ অস্ত্র-সে খরতর?
আমাদের সোনা হৈ-হৈ আর হুল্লোড়—নাও শুনি'।
সবুজ সবুজ, ঢাকুক সবুজ ঘাসে
চলে-আসা দিন, ফেলে-আসা দিন যতো।
রামধনু—রঙে ঝলমল নীলাকাশে।
ছোটে টগবগ বছর ঘোড়ার মতো।
গ্রহদের মুখ চেয়ো না, ভেবো না স্বস্ত্যয়নের কথাও;
আমাদের গান গ্রহতারাদের সওয়ার।
নক্ষত্রকে পিছে ফেলে মোরা জীবন্ত হব উধাও—
ধাত্রী মোদের সপ্তর্ষিকে শুধাও জবাব তার!
আনন্দসুধা পান করো, হাঁকো হৈ!
শিরা দপ্‌দপ্‌ বসন্ত বন্যায়!
ওঠো, বুক বাঁধো! ঘা মারো, মারো ঘা, ওই!
শোনো, বুকে বুকে ঝাঁঝর ঝন্‌ঝনায়।

অনুবাদ : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

শিকার-কাহিনী

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

ঘুরে ফিরে কাছে আসতে হয়। কাছে এলে কথা বলতে হবেই। অন্তত না বলে নিস্তার নেই। ফুল তা জানে। এবং হয়তো জানে বলেই আরো উদাস, আরো গম্ভীর, আরো নিস্পৃহ সাজা যায়। তার মানেই, নিজেকে কাবুলের কাছে আরেকটু আকর্ষণীয় করে তোলা। জানতে তো বাকি নেই কেন কাছে আসা, কেন কাছে আসে সবাই! তাছাড়া সে আর কাবুল। কে-ই বা কার কাছে আজো অজানা, অচেনা হয়ে আছে? তাদেরও চেনে সবাই।

—"যাবে নাকি?" কানের কাছে আবার ফিসফিসিয়ে ওঠে। মুখ দেখে বিশ্বাস করা কষ্টকর, কথাটা কাবুলের। কারণ, ও এখন অন্য দিকে তাকিয়ে। চোখে মুখে কিসের নিস্পৃহতা। নাকি অন্যমনস্কতা? বোঝা ভার। কাছে দূরে নানা বয়সের মেয়ের জটলা। কাবুল কাকে দেখে? ফুল বিস্মিত বোধ করে না। কিন্তু ভেতরে ঈর্ষা কী আদৌ অস্থির করে না? সুন্দরী না হোক, সে-ও তো মেয়ে। যৌবনে পা দিয়েছে কবে আর! দেহের বাঁধুনি অটুট। হৃদয়ের বোঝা-পড়া মুলতুবি রেখে, এ বয়সে শরীর দিয়েই সৌন্দর্যের ঘাটতি পূরণ কত সহজ।

প্ল্যাটফরমের শক্ত শানের গায়ে জুতোর নাল ঠুকে ঘোড়ার মতো পায়চারি করছে আরেকজন। সে শোভন সিং। মাঝে মাঝে কী ভেবে দাঁড়ায়। ঘাড় উঁচিয়ে ভিড়ের ভেতরে কাকে খোঁজে। কিন্তু কী আশ্চর্য, ঘুরে ফিরে চোখ জোড়া ফুলের মুখের ওপরে পড়বেই। আর চোখাচোখি যদি হলোই, না হেসে রেহাই পাওয়া দায়। অন্তত ঠোঁটের কোনে হাসির ভানটুকু জীইয়ে রাখতে হয়। অবস্থা গতিকে না হয় ঘর ছেড়ে স্টেশনে, প্ল্যাটফরমের ভিড়ে হাওয়া খেতেই আসে। তাই বলে এঁটুলির মতো গা থেকে ভদ্রতা-বোধটুকুও নখে টিপে বাতিল করে দেবে, নাকি দেওয়া যায়? তা ছাড় কৃতজ্ঞতা বলে যে বস্তুটি সমাজে, সংসারে, সভ্যতায় এখনো মজ্জা হয়ে বেঁচে

আছে, এক কথায় তুড়ি মেড়ে তাকেই কি উড়িয়ে দেয়া চলে, না উচিত? একটু আগে আদর করে কাছে ডেকে গোটা একটা পানই মুখে গুঁজে দিয়েছে। অমন করে কে দেয়, দিতে পারে কজন? আহা, জর্দার স্বাদ জিবে জড়িয়ে আছে এখনো। —"আমাদেরও সাধ-আহ্লাদ আছে, বুঝলে ফুলরানী। আমরাও মানুষ।"

—"এইবার এতক্ষণে বুঝলাম সেকথা।"

—"মাঝে মাঝে এই পোড়া চোখ দুটোও দেখতে চায় তোমাকে।"

—"মাইরি!" আকাশ থেকে মাটিতে পড়ার ভানটুকুই নিখুঁতভাবে ফোটাতে চেয়েছিল। না পেরে ফিরে এসে খুঁত খুঁত করছিল সেই কথা ভেবেই। এখন তাই চোখ টিপে আশ্বস্ত হলো ফুল। বাপের বয়সী এমন নাবালকের ইচ্ছাকে ঘায়েল করেই না আরাম?

সেই শোভন সিং মক্কেল পাকড়াবার ফাঁকে তাকে দেখছে। তাকেই পেতে চাইছে এখন। মানুষের মন-মেজাজের ঠিকানা ফুলের জানা।

ঘুরে দাঁড়ায় ফুল। কোমর থেকে বাঁ হাতখানা নামিয়ে দেহের সমান্তরাল করে ঝুলিয়ে দেয়। যেন এই হাতের করণীয় আর কিছু নেই। করবার ক্ষমতা বলতে কিছু নেই। শাড়ি-ব্লাউজে ঢাকা কাঁধের তলায় সুতো বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বাড়তি, অপ্রয়োজনীয় একখানা হাত। গোল কব্জিটা কী নিটোল, মসৃণ বাদামী চামড়ার গায়ে তুলির আঁচড়ে টানা জল-রং কাঁচের চুড়ি-কটা অবধি শব্দহীন।

পা দুটো টন-টন করছিল। মাংসল উরুর ভেতরে সরু আর শক্ত হাড় দুটো ব্যথায় চিন-চিন করছে এবার। এক নাগাড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়। অস্বস্তির সীমা ছাড়াতে থাকে ফুল। কার যেন কথা ছিল আসার। সে এখনো এল না। রং মাখা ঠোঁটের কোনায় ব্যথার আর বিরক্তির আভাস স্পষ্টতর হতে চাইল। বাঁ পায়ের ওপর শরীরের সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে ডান পা-টা এক পাশে ছড়িয়ে দিল। ইংরেজী বর্ণমালার প্রথম অক্ষরের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। দূর থেকে মনে হবে, কোনো কারণ বশত একটা পা না জানি ছোটই হবে ফুলের। লাল টকটকে শাড়িটা সর্বাঙ্গে অগোছালো ভাবে জড়ানো। এমন রোদ্দুরে ফুল আগুন হয়ে জলছে।

দূরে ঘন্টি বাজিয়ে জানিয়ে দিলে কে, গাড়ি আসছে! যত দূরে চোখ যায় চেয়ে রইল ফুল। ব্রীজের গায়ে খণ্ড, বিচ্ছিন্ন হাতগুলিই রোদ্দুরে শুকোতে

দিয়েছে কে! এঞ্জিনের ধোঁয়া চোখে পড়ছে না এখনো। নিচে মাটি খুঁড়ে অসংখ্য কেন্নো ওপরে উঠে এসেছে। গায়ে গা লাগিয়ে রোদ পোয়াচ্ছে এখন। লাইনের দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ফুল তাই আকাশ দেখে। আকাশ এখন টল-টলে নীল দীঘি। কাটা ঘুড়ির মতো চিলটা ভাসতে ভাসতে লাট খাচ্ছে। আস্তে ওপরে উঠে যাচ্ছে। ছোট হচ্ছে ক্রমশ। দেখতে-দেখতে চিলটা ছোট্ট প্রজাপতি হয়ে গেল। আরো কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ফুল চোখ নামাল। কারণ গাড়ির শব্দ শোনা গেল তখন। ব্রীজের তলা দিয়ে গাড়িটা হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে আসছে। প্ল্যাটফরম ছুঁই ছুঁই করছে এবার। নড়ে চড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল ফুল। গা ঝাড়া দিয়ে চাঙ্গা হতে চাইল। ওর চোখে মুখে কিসের উৎকণ্ঠা। সর্বাঙ্গে কার প্রতীক্ষা। নড়ে চড়ে পা দুটো গুছিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ঈষৎ চঞ্চল মনে হলো ওকে।

আবার চেয়ে থাকা। কামরায় কামরায় খুঁজে দেখার পালা শুরু। কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়। সে আসেনি। অথচ অন্ধকার মাঠে বসে কত আদর। গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ কোমর জড়িয়ে সেই মন তাতানো অশ্রাব্য সব কথা! পকেটে পয়সা ছিল না? ও-কটা পয়সা হাতে গুঁজে দিয়ে না শোনালেই কী হতো না তখন? কে চেয়েছিল? মাথার দিব্যি দিয়েছিল কে?

রুমালে হাত মুছতে মুছতে বলেছিল, "এসব কিচ্ছু না, বুঝলে ফুলু? শুধু এরই জন্যে সময় পেলে ছুটে আসি ভেব না। আসলে তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। দুদিন দেখতে না পেলেই মন কেমন করে। তোমার করে না ফুলু?"

আবার আদর করে ফুলু ডাকা হয়। ফুল না। ঝামার মতো খসখসে ধারালো গালটাই ফুলের নরম ময়দার ড্যালার মতো চিবুকে ঘসতে ঘসতে কথা বলে ফের। ফুল উত্তর না দিয়ে বাঁ হাতে পয়সার ছোট্ট সুন্দর ব্যাগটাই বুকের তলায়, ব্লাউজের আড়ালে চালান করে দেয়। ডান হাতে গলা জড়িয়ে ধোঁয়াটে গন্ধমাখা পুরু কালচে ঠোঁটের ওপরেই পাতলা আর রক্তাক্ত ঠোঁট দুটি চেপে রাখে ফুল। বোবা হয়ে যায় লোকটা। বলার মতো আর একটি কথাও খুঁজে পায় না। বরং পোষমানা বেড়ালের গলার সেই অস্পষ্ট মুখের গোঙানী শোনা যায়।

—"কবে আসবেন আবার?" ট্রেনের জানলায় হাত রেখে ফুলের সেই শেষ প্রশ্ন।

"কালকেই আসতে হবে ফের, কালকেই। আজ আর ভালো করে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব না ফুল।"

বিশ্বাস না করে উপায় ছিল আর? আশ্বস্ত হয়েছিল ফুল। নির্দ্বিধায় আংটিটা আঙুল থেকে খুলতে দিয়েছিল। কথা ছিল, পছন্দসই পাথর-বসানো আরো একটা নিয়ে আসার। কেউ তো দেয় না। ও তবু মুখ ফুটে বলেছিল। মাপ না দিলে আনা যায়?

সাত-সাতটা দিন কেটে গেছে। গলা টিপে আশাটাকে মেরে ফেলা তবু অসম্ভব মনে হয়। যদি আসে! ভাবতে রোমাঞ্চ লাগে। নইলে এমন দুপুরে ফাঁকা ফাঁকা লাগে! উড়ু-উড়ু করে মন। ধান্দা কি একটাই ফুলের? ঝামেলা কি এতই কম? তবু সব ভুলে দাঁড়িয়ে থাকার সাধনায় মগ্ন হতে হয়। রোজ রোজ একটি মাত্র মানুষের খোঁজে অন্তত একবার এইখানে আসতে হয়। সে যদি তবু আসে। পুরোপুরি হতাশ হতে পারে না। ভয় হয়। ভয় আর কষ্টের একটা মিশ্রিত অনুভূতিই আপাতত আবিষ্ট করে রাখে। অবশ্য নিছক একা একা লাগার কোনো মানেই নেই। কারণ, ইচ্ছে হলেই সঙ্গী জুটিয়ে নেয়া যায়। যেখানে খুশি চলে যেতে পারে। নিজের তরফ থেকে একটুখানি ইসারা চাই শুধু। সামান্য ইঙ্গিতের অপেক্ষা। ফুল তা জানে। আর জানে বলেই মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করে না। বরং "দেখাই যাক" ধরনের এক অনিচ্ছাকৃত উদাসীনতাকে লাই দিয়ে, পোষ মানিয়ে বুকের গোপনে বড় করতে চায়। অন্তত জীইয়ে রাখার সাধ তো তুচ্ছ ভেবে উড়িয়ে দিতে পারে না।

ভয়ঙ্কর ক্লান্ত মনে হয়। শরীর মন ভেঙে পড়তে চায়। কাঁদবার একটু ঠাঁই চাই এখন। নিজেকেই অকথ্য, অশ্রাব্য ভাষায় চিৎকার করে গালাগাল করার মতো নির্জনতা। এই দুঃখ কোথায় লুকোবে ফুল। এই পরাজয়ের, এই গ্লানির কথা শোনাবার যুগ্যি কে? কই, বিশ্বাস করার মতো মানুষ যে চোখেই পড়ে না আর! ভরসা করার মতো একটি মুখও মনে পড়ে না। অথচ বিশ্বাস করেছিল ফুল। কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছিল তখন। সমস্ত অসহায়তা থেকেই চিরকালের মতো মুক্তি পেতে চেয়ে ক-দিনের আলাপে, ঘনিষ্ঠতায় লোকটাকে ভেবেছিল আপনার চেয়ে আপন। নির্বান্ধব

পৃথিবীতে তার একমাত্র অবলম্বন ভেবে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। হায়রে দুরাশা!

—"তোমার মতো কাউকে এতদিন খুঁজছিলাম। আমি তোমাকে সব সময়ের জন্যে চাই ফুলু।"

—"শুনলে ভয় করে যে!" ফুল না কেঁপে পারে নি। তখন কষ্ট হচ্ছিল ভীষণ। চোখের সামনে স্পষ্টতর হতে চাইছিল একটা আগুন-লাগা অন্ধকার রাত্রি। আর্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। মাংস-পোড়া গন্ধটা টের পাচ্ছিল ক্রমশ। ভয়ঙ্কর আনন্দে, উত্তেজনায় কারা মেতে উঠেছিল। তাদের হাতে বর্শার ফলাগুলি হিংস্র শ্বাপদের জিবের মতো লকলক করছিল। আর দাউ দাউ করে জলছিল অসংখ্য মশাল। সেই রক্তাক্ত আলোর আভা লেগে কয়েকটি পরিচিত, নিষ্পাপ, করুণ মুখ সহসা বীভৎস আক্রোশে জলে উঠেই ছাই হয়ে গেল। শিকারের চারপাশে আদিম পুরুষেরা তখন দিশে হারিয়ে নাচছিল। অনেক দূরে নদীর ওপারে আকাশ-জোড়া বিশাল প্রান্তর অসংখ্য কঙ্কাল করোটি বুকে নিয়ে হয়তো এখনো শ্মশান হয়ে পড়ে আছে। মুহূর্তে এইসব দৃশ্য ফুলকে ব্যাকুল করে তোলে। সে তাই ভয়ে-ভাঙা গলায় প্রায় না-শোনার মতো বলে, "বিশ্বাস হয় না। বুক কাঁপে।"

—"এ্যাই ছাখো! তোমার চোখেও যে জল আসে ফুলু! কাঁদবার মতো কী বলেছি আমি?" সারা মুখে একই সঙ্গে বিরক্তি আর অস্বস্তি ফুটিয়ে চেয়ে থাকে লোকটা। বোকার মতো আরেকবার জড়িয়ে ধরতে চায়। বলে, "আমাকে ভয়?"

ধরা দেবার বদলে সরে যায় ফুল। আগে আগে ছুটতে থাকে। গঙ্গার ধার থেকে স্টেশনেই পালিয়ে আসে।

এইখানে দাঁড়িয়ে কথা দিয়েছিল আসবে। যেমন সবাই দেয়। অনেকেই দিয়েছে ফুলকে। তাদের কাউকে মনে পড়ে, আবার পড়েও না কাউকে।

হাঁটতে হাঁটতে ফুল সেই পুরনো, পরিচিত জায়গাটায় এসে দাঁড়ায়। এইখানে দাঁড়ালে ফাঁকা লাগে। জায়গাটা নির্জন। এখানে দাঁড়ালে সবাইকে দেখা যায়। লাইনের এপারে-ওপারে যে আছে, যা কিছু আছে, সব। ফুল তাই নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে দেখে। দেখে আর ভাবে। আলতো ভাবে পিঠ আর মাথার পেছনে চালতের মতো গোল আর প্রকাণ্ড খোঁপাটাই স্টেশনের নাম লেখা হলদে বোর্ডের গায়ে চেপে ধরে। ঝিমুনি আসছে। ঘুম পাচ্ছে

এখন। সারাটা দুপুর এমনি একলা কাটাতে হবে হয়তো। কেউ আসবে না। কাউকে পাওয়া যাবে না আর।

এমনি করেই বেলা যায়।

সারাটা সকাল ঘুরে বেড়িয়েছে। অকারণ চা খেয়েছে কয়েকবার। ইচ্ছে ছিল না, তবুও। মনে মনে ঘরে ফেরার সাধ আর বুঝি নেই। কিন্তু কোথায় যাবে এবার! বাজারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিশুর সঙ্গেই কথা হয় খানিক।

—"কাবুল যে! ছাড়া পেলি কবে?"

—"এক হপ্তা হয়ে গেছে।"

—"বাড়ি যাসনি?"

—"না।"

—"কেন?"

—"বাবার বউটা আমাকে দেখলে কেমন নাক সিঁটকোয় রে বিশে।" কথায় কথায় বেপরোয়া হতে চাইলেও কাবুলকে এখন অসহায় দেখায়। লক্ষ্য করে বিশু, জেল থেকে রোগা হয়ে ফিরেছে। চোখের কোণে কালি জমেছে। কাজল পরেছে মনে হয়।

—"তোর মা হয় না?" ছিপি খোলা বোতলের সোডা উথলে গড়িয়ে পড়ে আর কি! ঢোক গিলে হাসিটাকে হজম করে বিশু।

—"আমার জন্যে কালীকে দেখতে গিয়েছিল বিধু ডাক্তার, তোর মনে আছে? কিন্তু লোভ সামলাতে না পেরে নিজেই বিয়ে করেছে।"

বিশু আর এগোতে সাহস পায় না। কাবুলকে চেনে, মনের যুগ্যি কথা না পেলে ছুরি বের করবে এখুনি। যা ওর স্বভাব। জেলের ভাত ছাড়া মুখে আর কিছুই রোচে না। অথচ একসঙ্গে পড়তে গিয়েছিল কলেজে। ভাবলে অবিশ্বাস্য ঠেকে সব। গৌরীর গায়ে হাত তুলে কলেজের পাট চুকিয়ে দিল কাবুল। ওদের ভালোবাসার গল্প কে না জানে?

—"কী করবি এখন?" বিশু হাত ধরে—"চ, চা খাবি আয়।"

বিষ নজরে দেখে সবাই। একসঙ্গে সব ক-টি চোখেই ভিড় করে সন্দেহ আর শঙ্কা। কেয়ার করে না কাবুল। লক্ষ্য করে না কাউকেউ। চা খেতে খেতে অন্যমনস্ক হতে চায়।

বাইরে এসে শোভন সিংয়ের কাঁধে হাত রাখে। বিশুকে বলে, "চলি।"

—"কী ব্যাপার?" আঁতকে ওঠে শোভন।

—"কটা প'সা চাই। পকেট গোরস্তান হয়ে আছে মাইরি। মাল খেতে চাইছে প্রাণটা।" কাবুল দাঁত বের করে।

তারপর ঘুরতে ঘুরতে স্টেশনে এসে হাজির। তাছাড়া ঠাঁই কোথায়! একপাল শ্যাল-কুকুরের বাচ্চার মাঝখানে বিধু ডাক্তার তো কালীকে নিয়েই মশগুল!

মাঝে মাঝে হাওয়া বয়। উষ্ণ, অবাধ্য বাতাস। চোখ মেলে তাকাতে হয়। হাওয়ার হাতে ছেঁড়া কাগজ, ময়লা ন্যাকড়া, শুকনো পাতা আর ধুলোর ঘূর্ণি দেখে দেখে একসময় চোখ জ্বালা করে। জ্বলে পুড়ে ছাই হতে চায় সমস্ত শরীর। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। আনমনা আকাশ দেখে ফুল। দেখার ভান?

প্ল্যাটফরমের কোনাকুনি চায়ের দোকান। ট্রেনটা ছেড়ে দিলে আবার নির্জন, নিঃসঙ্গ। কে কোথায় চলে গেল! সেই ভীড় নেই, সেই কোলাহল। কিছুক্ষণ পায়চারি করে দু-বার সামনে এসে আবার এগিয়ে গেল কাবুল। কী বলবে, কী বলা যায়, কী করা যায় এখন? দ্বিধা না ভয় না দুর্বলতা বোঝা ভার। মাঝে মাঝে এমনি অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে কিনা মনেই পড়ে না। হয়তো আজকের মতো এমন করে হয়নি কখনো। তাই অস্বস্তি বোধ করে। চলে গেলেই হতো। আবার সেই বিকেলে গাড়ি। ততক্ষণ বসে থাকতে হবে। অথচ কেন, কার জন্যে বসে থাকবে জানে না বলে কষ্ট পাচ্ছে এখন। আফসোস হচ্ছে। শেয়ালদা ইস্টিশানে চলে গেলেই হতো। ফাঁকা ফাঁকা লাগত না। দেখা হয়ে যেত কারো সঙ্গে। অথচ কী ভূতেই যে পেল তখন। পা-দানিতে পা রেখে পিছিয়ে এল ফের। ওকে দেখল, ওঠেনি। ওর চোখ কাকে খুঁজে বেড়ায়। কাকে?

শালার নিকুচি করেছে অত ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাবার। মনে মনে নিজেকে, নিজের আহাম্মকপনাকেই খিস্তি করার রোখ চেপে যায়। রাগে জ্বলতে থাকে কাবুল।

ফি-বেস্পতিবারেই কোমরে গেঁজলে বেঁধে কলকাতা যায় মদন ঘোষ। পিছু নিলে কী ক্ষতি ছিল তখন? তা না, মাগী তখন এমন করে তাকালে! যেন বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভাঙাচ্ছে! ছেনাল আর কাকে বলে। চিনতে কি

ন-শো পঞ্চাশ বছর লাগে? কাবুল চেনে, জানে কোন্ বস্তু আসলে কী। আর এতো ফুল! চোখের সামনে ড্যাব ড্যাব করে ধিঙ্গি হলো মেয়েটা। কাবুল ওর নাড়ি-নক্ষত্র না জানে কী?

ধুলো শুঁকতে শুঁকতে নেড়ি কুত্তাটা পায়ের কাছে আসে। পা দেখে থমকে যায় বুঝি। লেজ নাড়তে নাড়তে খুশি জানায়।

তাড়িয়ে দিল না ফুল। সরে দাঁড়াবার কথাটা ভাবল না একবার। বরং আড়চোখে আরেকবার শোভন সিংকে দেখে। পেট মোটা চামড়ার ব্যাগটা বার করে পয়সা গুনছে। নোট বার করে দেখাতে চাইছে বার বার। হাসি পেল, তবু হাসল না ফুল। বরং আরো উদাস, আরো কঠিন হতে চেয়ে দুই চোখ ছড়িয়ে দিলে দূরে, অনেক দূরে। প্রায় নির্জন প্ল্যাটফরমের ওপরেই কয়েক চক্কর ঘুরে বেড়াল একা। আর ঠিক তখুনি, শূন্যে ঝুলন্ত গোল আর প্রকাণ্ড ঘড়িটা দেখা গেল। সময়ের দুই পাড়ে কালো নিস্পন্দ দুটি হাত যীশুর অন্তিম ছবিটি মনে পড়ায়। কত আর বয়েস হবে তখন যেদিন ইতিহাসের পাতায় ছবিটি খুঁজে পেয়েছিল ফুল! বাড়ি বেচা টাকার আদ্দেক ভাগ বুঝে নিয়ে শ্বশুরের কাছে চলে গেল কাকা। বছর না ঘুরতে বস্তির ঘরে উঠে আসতে হলো মা-বাবার সঙ্গে। মরবার আগে বাবাকে তাই নিয়ে কত কথাই না শুনিয়েছে মা, উঠতে বসতে খোঁটা দিয়েছে।

—"এই তো মায়ের পেটের ভাইয়ের নমুনা। লেখা-পড়া শিখিয়ে সর্বস্বান্ত হলে, এখন দেখে না? দেখতে আসে না তোমাকে?"

—"আহ্, বড় বউ!" লাঠি হাতড়াতে হাতড়াতে বাধা দিতে চাইত বাবা। মুখে চোখে অস্বস্তি আর বিরক্তির অভিব্যক্তিটুকুই আরো পরিষ্কার করে ফুটিয়ে তুলত, "কপাল ছাড়া দোষ কার দিই বলো তো? বরং এসো তার চাইতে আমরা ক্ষমা করি সবাইকে।"

কথা শুনে কাঁদতে বসত মা। সেই মা মরে গেলে ছ-মাসের বেশি টিঁকতে পারে নি বাবা। যাবার আগে ছোট ভাই তিনুকে বলে গেল, "তোর দিদি রইল। ওই তোর মা, ওই তোর বাবা।"

বাজারে যাবার নাম করে সেই তিনুও একদিন কোথায় চলে গেল। বছর ঘুরে এল, তবু ফিরে আসার নাম নেই!

দুই চোখ ছলছলিয়ে ওঠার আগেই চারদিক গমগম করে ওঠে। লাইনের

ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে একটা আধ মাইল লম্বা সরীসৃপ। মাল-গাড়িটার এখানে থামার গা নেই আদৌ। ফুল গাড়ি দেখে। কান পেতে শব্দ শোনে, চাকার শব্দটা দূরে মিলিয়ে গেলে আবার সামনে তাকাবার পালা। নিস্পন্দ ঘড়ির নিচে প্রার্থনার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কাবুল। সামনে দাঁড়িয়ে শোভন। কী বোঝাতে চায় ওকে! কাবুল হাত পাতে। ব্যাগ খুলে টাকা বার করে লোকটা। প্যান্টের পকেটে টাকা সুদ্ধ হাতটা ঢুকিয়ে মাথা কাত করে কাবুল। ক-টাকা গুণে দেখবার অবসর বুঝি নেই আর। কাবুলকে সহসা ব্যস্ত আর তৎপর মনে হয়। টাকার কথা ভাবলে গা শির শির করে। মন খারাপ হয়ে যায় ফুলের। ক্ষিদে-তেষ্টার কথা মনে পড়ে। পেটের ভেতরে সেই গোঁয়ার, অবাধ্য পশুটাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়। গা বমি বমি। রগ দুটো টিপ টিপ করে।

হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকার শোনা গেল। একটা চাপা আর অস্ফুট গোঙানী কেমন ভীত, সন্ত্রস্ত এবং চঞ্চল করে তুলল সবাইকে। ফুল ভয় পেল। মাল-গাড়িটা পেরিয়ে যেতেই সবাই ছুটোছুটি শুরু করেছে। একসঙ্গে ছুটে চলেছে সবাই। ফুল আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। প্ল্যাটফরম ছাড়িয়ে ভিড়ের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।

চোখ মেলে দেখা যায় না। ফুলের শরীর হিম হয়ে আসে।

—"ইস, বাচ্চা ছিল হে পেটে!" আফসোস জানায় বুড়ো মতো লোকটা।

—"একটা না, তিন-তিনটে বাচ্চা।" কুলিটা মাথা নাড়ে।

থুথু ছিটিয়ে নাকে রুমাল চাপা দিলে কাবুল। তেরচাভাবে শরীরটা দোফালা হয়ে গেছে!

—"জুতোটা ছিল কার? কার জুতো মুখে নিয়ে ছুটে যাচ্ছিল হে?" টিকিট চেকার কুলিটার মুখ দেখল। জুতোর মালিক এগিয়ে এল না।

এক ফোঁটা রক্তের দাগ লেগে নেই কোথাও। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। জিবের ওপর নাচানাচি করছে মাছি। এরই মধ্যে খবর পেয়ে গেছে। নাড়ি-ভুঁড়ির সঙ্গে লেপটে রয়েছে তিনটে অপুষ্ট বাচ্চা। আধখানা শরীর স্লিপারের ওপরে শুইয়ে, বাকি আধখানা লাইনের বাইরে ফেলে রেখে দৈত্যের মতো গাড়িটা এখন কোথায় চলে গেছে। লাইনের গায়ে থেঁতলানো মাংসের শুকনো দাগটুকু পর্যন্ত লেগে নেই।

মিলের হাজিরাবাবু এসেছিল মাসতুতো বোনকে নিয়ে। মোটা টাকার চেক লিখিয়ে নিয়েছিল বিধুডাক্তার। মেয়েটা বাঁচেনি। তার পরেই হাজিরাবাবুর ছেলের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ পত্র পেল বিধুডাক্তার। টাকাটা অবশ্য ভোগে লাগাতে পারেনি। হিন্দী ছবির নায়ক হতে চেয়ে বোম্বে পালিয়ে গিয়েছিল কাবুল। কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপিয়েও খোঁজ পায়নি কেউ।

রোঁয়া ওঠা সেই কুকুরটাই। একটু আগে ফুলের পা শুঁকতে গিয়েছিল। দৃশ্যটা দুই চোখে বান ডেকে আনে। একটা অদেখা আতঙ্ক তলপেট থেকে বুকের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসতে চাইছে। অন্ধকার হয়ে আসে সব। মাথা ঘোরার সেই অচেনা রোগটাই ফের পেয়ে বসে ওকে। একে একে সবাই চলে গেল, ও তবু দাঁড়িয়েই থাকে। পা চালাবার ভরসা অথবা সাহস খুঁজে পায় না। কাবুল হাত চেপে না ধরলে ও হয়তো পড়ে যাবে এক্ষুনি।

কিন্তু কাবুল তা করে না। বরং আরো শোভন, আরো শালীন হতে চায়। দিনের আলো কিনা প্রচণ্ড ভাবে উজ্জ্বল, উত্তপ্ত করে রেখেছে চারদিক। তাই খোলাখুলি সব কথা বলা, সবকিছু চাওয়া ঝকমারি। বাক্স-প্যাটরায় বন্দী বাতিল দামী পোশাক-আশাকের মতো ছেঁড়া-খোঁড়া মনের এই দুর্ধর্ষ কামনা-বাসনাগুলিকেও বাইরে প্রকাশ্য দিবালোকে টেনে আনা আর দায় নয়, দুঃসাহস। কাবুল তাই বুঝে-সমঝে বলতে চায়। অনভ্যস্ত, আনাড়ি তো না। জানে, মতলব হাসিল করার কায়দা কসরৎ সব।

—"আজ তাহলে চলে যাব ফুল?" উত্তরের কেবিন ঘরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে কাবুল। কেমন সহজ সুরে, নির্বিকারভাবে বলে যায়। যেন ফুলের আশায় ঘুরে বেড়িয়েছে সারাদিন। ফুলের জন্যে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা। নইলে কত কাজ কাবুলের।

চমকে ওঠার ভঙ্গিটা নিখুঁতভাবে ফোটাতে গিয়ে আরেকবার হিমশিম খেল। কিন্তু বিচলিত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে বেশিক্ষণ লাগে না। ফুল বলে, "কোথায়?"

—"দেখি কোথায় যাওয়া যায়!" যেন বিশ্ব-সংসারের বাইরে অন্য কোনো জায়গা ঠিক হয়ে আছে। ইচ্ছে হলে কাবুল এখন সেইখানেই চলে যেতে পারে। মুখে-চোখে তেমনি এক অপার্থিব বিশ্বাস ফুটিয়ে মহাপুরুষের মতোই উদাস, উন্মনা হতে চায় ও।

ফুল দেখে। দেখে হাসি পায়। সারাদিনে এই বুঝি প্রথম কৌতুকে

ফেটে পড়ার সাধ ওকে মরিয়া করে তোলে। কিন্তু না, নিজেকে সংযত করে রাখাই সমীচিন। বরং পা টিপে টিপে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে এগিয়ে যাওয়াই উচিত। দীর্ঘশ্বাসে বুক কাঁপিয়ে বলে, "বাড়ি যাওনি ?"

মাথা নাড়ে কাবুল। করুণ হাসি হেসে বলে, "কার বাড়ি কে যায় !"

কথা না বাড়িয়ে ফুল এবার হাঁটতে শুরু করে। লাইন ধরে সোজা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। কাবুল তখনো চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ঘেয়ো কুকুরের মরা দেহটাই দেখছে। সবকিছু গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছে। ফুল, সেই চেনা ফুলকেই এখন অচেনা লাগে। রাগের বদলে ও এখন অস্বস্তি বোধ করে। নির্দ্বিধায় যেতে পারছে কই ?

কিন্তু আড়ষ্টতা ভাঙাতে নিজেই এগিয়ে আসে ফুল। না এসে লাভ ? মিছিমিছি দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। হা পিত্যেশ নিয়ে চেয়ে থাকতে হবে, চেনামুখ যদি কাছে আসে কেউ।

—"কী হলো আবার ?" কণ্ঠে ব্যস্ততা আর বিরক্তি ফুটিয়ে চেয়ে থাকে ফুল। "চুপসে গেলে যে ? যাবার সাধ ফুরিয়ে গেল ? ভালো।" মাথা ঝাঁকাল ফুল। কাবুলের সেই অনেক দেখা, অনেক জানা মনোহর হাসিটাই হেসে দেখাল। এক মুহুর্তের জন্যে মাজনের বিজ্ঞাপনের একটা ছবিই হয়ে গেল ফুল।

—"না, কিছুনা। একটু দম নিলাম আর কি। চলো।" গা ঝাড়া দিয়ে কাবুল এবার সঙ্গ নিল।

তারপর ওরা হাঁটতে থাকে পাশাপাশি। কখনো আগে-পিছে চলতে শুরু করে। রেল লাইন ছেড়ে বাঁধানো সড়ক, সড়ক ছেড়ে মাঠ, মাঠ ছেড়ে গ্রামের দিকে এগিয়ে যায়। কথা হয় টুকটাক। আবার হয় না কিছুই। প্রাণের কথা বলা কী এতই সহজ, এত শীগগির কী বলা যায় সব ? দেনা-পাওনার সমস্ত হিসেব মেটাতে সময় চাই, নির্জনতা চাই। যে কারণে শহর ছেড়ে এতদূরে ছুটে আসা।

—"চা খাবে ?" সামনে ছোট্ট চায়ের দোকান। দোকানী ঝিমোচ্ছে। দেখে থমকে দাঁড়াল কাবুল।

মাথা কাত করে ফুল। ওরা এগিয়ে গেলে দোকানী খাতির করে বেঞ্চি পেতে দেয়।

চা খেয়ে ফুল বলে, "মিছিমিছি হাঁটতে ভাল্‌লাগে না। এমন জানলে কে আসে।"

—"পয়সা দিচ্ছি না! মাগনা প্রেম বিলোচ্ছ নাকি ?" সেই-কাবুলের গলা শোনা গেল এতক্ষণে, যার নামে শহর কাঁপে ঘৃণায়, রাগে, ভয়ে। হাজত যার বাসরঘর, জেল যার সংসার! কালোয়ার শোভন সিংয়ের সাকরেদ সেই কাবুলই কথা বলছে এখন!

গতি শ্লথ হয়ে আসে। এগিয়ে যাবার সাহস আর খুঁজে পায় না ফুল। দ্বিধা সঙ্কোচের জড়তা কাটিয়ে পুরোপুরি নির্ভয় হতে পারে না। আড়চোখে সর্বাঙ্গ দেখে নেয় একবার। অন্য সময় হলে হাসি পেত। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর কপালের ঠিক ওপরেই ফেনিয়ে তোলা রুক্ষ চুল, মোটা আর রোমশ হাতের কব্জিতে বাঁধা কালো কার, কোমরে জড়ানো চামড়ার বেল্ট, এমনকি পায়ে রবারের চটিটা পর্যন্ত দেখে ফিরে যাবার সাধটাই বুঝি তীব্রতর হতে চায়।

কাবুল টের পায়। বাঁ হাতখানা কাঁধের ওপরে রাখে। ফুল ততক্ষণে শক্ত, কাঠ হয়ে গেছে।

—"কী গো, আমাকে তুমিও ভয় করতে শুরু করলে, ফুল ?"

চেষ্টা করে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে ফুল। বলে, "কেন ? সাপ, না বাঘ তুমি ?"

—"সবাই কেন একথাটা বোঝে না ফুল ?" গলাটা ভেজা ভেজা শোনাল। হঠাৎ বড় অসহায়, বড় করুণ মনে হলো কাবুলকে। ফুল বিস্মিত হতে চাইল। "চলো আরেকটু এগোই। ফাঁকা দেখে একটা গাছতলায় বসব।" কাঁধ থেকে শক্ত থাবাটা আলগা হয়ে কনুইয়ের কাছে নেমে আসে। বগলের তলায় হাত রাখে কাবুল। গা ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে থাকে ফুল।

মাতালের মতো টলতে টলতে সূর্যটা এবার আকাশের কোনে কাত হয়ে পড়তে চাইছে। মাতালের চোখের মতো রং হয়েছে রোদের। নির্জন ছায়ায় দাঁড়িয়ে কাবুল কী ভাবে। মাথার ওপরে ছাতা মেলে ধরেছে বিরাটাকার প্রাচীন এক বট। কচিৎ পাখি-পাখালির ডাক শোনা যায়। আশ-পাশে ভাট আর আশ-শেওড়ার জঙ্গল। চারদিক ছায়া ছায়া। ভয় আর বিষাদে থমথমে।

বুকের ঢাকনা সরিয়ে আঁচলটা কোলের ওপরে জড় করে রাখল ফুল।

প্রায় অনুচ্চারিত কণ্ঠে বলল, "বেলা যে যায়, বসো। ফিরতে হবে না আবার ?" পা দুটো সামনে ছড়িয়ে হাত দুটো কনুই থেকে ভেঙে ঈষৎ ক্লান্ত ভঙ্গিতে আধশোয়া হয়ে থাকে ফুল।

স্থির, অপলক দুটি চোখে কাবুল তখনো দেখছে। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে শোভন সিংয়ের দেওয়া টাকার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে নিঃশ্বাস ক্রমশ উষ্ণ আর ঘন হচ্ছে কাবুলের। চোখ চেয়ে ফুলকে দেখার সাহস যেন নেই আর। বরং অক্টোপাসের মতো বটের মোটা আর জীর্ণ অসংখ্য শেকড় চোখে পড়ে। অজস্র আঙুলে পৃথিবীর অতল অন্ধকারকেই আঁকড়ে আছে কত যুগ, কত শতাব্দী ধরে। মৃত ময়ালের মতো জটগুলি মাটির গভীরে মুখ ডুবিয়ে রেখেছে লজ্জায়। অবিচ্ছিন্ন ছায়ার দিকে তাকালে সৃষ্টির আদিমতম অন্ধকারকে আবিষ্কার করা যায়। পৃথিবীর প্রথম পুরুষের চোখে কাবুল এইসব দেখে।

ধনুকের মতোই নরম দেহখানা দুমড়ে, মুচড়ে প্রায় শুইয়ে রেখেছিল। কাবুলের দিকে চেয়ে বিরক্তি বোধ করে ফুল। স্বরে অধৈর্য মিশিয়ে ডাকে, "কী, অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ যে ?" খপ করে হাত ধরে বুকের ওপরে টেনে নেয় কাবুলকে। তার উদোম কাঁধ শক্ত করে চেপে ধরে কাবুল বলে, "তোমার আর লজ্জা করে না, না ?"

ফুল তখন কথা বলে না। বলতে পারে না। চোখের পাতা বুজিয়ে বিচিত্র হাসে।

কাবুল চুমো খায়।

—"মাঝে মাঝে আমারও ইচ্ছে হয়—" ফুল বুঝি ঘুমিয়ে পড়বে এখুনি। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

—"কী ?" শাঁড়াশির মতো দুই শক্ত পেশল বাহুর চাপে ফুলকে বুকের ভেতরে পিষে, গুঁড়িয়ে ফেলতে চায় কাবুল। বলে, "কী ইচ্ছে তোমার ?"

—"মা হতে ইচ্ছে করে।" যেন গোঁয়ারের মতো ফুল বলে ওঠে।

একটু আগে দেখা মরা কুকুরের ছবিটা চোখে ভাসে। হঠাৎ গা ঘিন-ঘিন করে কাবুলের। নিজের অজান্তে দেহ-মন শিথিল হয়ে আসে। হাত দুটো অবশ হয়ে যায় মুহূর্তে। ফুল অবাক না হয়ে পারে না।

—"তুমি কাউকে ভালোবাসনি কোনোদিন, কোনো মেয়েকে ?"

—"না।" চোয়াল কঠিন হলো কাবুলের। কী ভেবে ফের বলে,

"ভালোবাসা-টাসা আমার আসে না ফুল। মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছু বুঝিনে। মন-টন বাজে, বোগাস সব।"

—"অ।" ফুল ভয় পেল, আহত হল যেন।

—"কালীকে ভালোবাসতাম। বিধু ডাক্তারের বউকে।"

—"তোমার মা যে।" আঁতকে উঠল ফুল।

—"ছাই! বিধু ডাক্তার আমার মাকে মেরে ফেলেছে।" গলা বুজে আসছে কাবুলের। ফুল টের পায়।

—"কেন ? কী করেছিল তোমার মা ?"

—"কিছুই করেনি। মাকে মেরে বিধু ডাক্তার লাইফ্ ইন্‌সিওরের টাকা বাগিয়েছিল।"

ফুল চমকে ওঠে। কাবুল টের পায়, ও কাঁপছে।

—"আমার মাকে মেরে কালীকে বিয়ে করল। কালী ভালোবাসে টের পেয়ে তাড়িয়ে দিলে আমাকে।"

—"তুমি আর ও-বাড়ি যাওনা!"

—"না।"

আর কোনো কথা নেই। দুজনেই চুপচাপ। দুজনেই বিষণ্ণ। কেউ কাউকে মুখ দেখাতে চায় না আর।

অন্ধকার মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে হাই তোলে কাবুল। এক-দুই করে আকাশের তারা গোনে ফুল। ফিরে যাবার কথা মনেই পড়ে না আর। কাবুল ভাবে, ফুল একদিন ট্রেনের তলায় গলা দেবে। কিন্তু ওর গর্ভের অন্ধকারে ঘুমন্ত শিশুটির মুখ হুবহু তারই মতো! কথাটা ভাবতে গিয়ে এক অজানা আতঙ্কে কেঁপে ওঠে কাবুল।

কাবুলের কথা ভাবতে গিয়ে কান্না পেল ফুলের। ওর দুঃখ ওকে একা, অসহায়, নিঃসঙ্গ করে তুলেছে। মুহূর্তের জন্যে কাবুলকে নিষ্ঠুর কিংবা ঘৃণ্য ভাবতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল ফুলের। কী একটা গোপন আর জরুরি কথাই বলতে চেয়ে পারে না। কৃমির মতো দানা পাকিয়ে গলার কাছেই এসে যায় কথাটা। কণ্ঠনালী ব্যথায় টনটনিয়ে ওঠে তখন।

প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে কাবুল বলল, "কত!"

ফুল উদাস কণ্ঠে বলল, "যা হয় দাও।"

আস্ত পাঁচটাকার নোটটা হাতে গুঁজে দিয়ে কাবুল হাসতে হাসতে বলে, "বেঁচে থাকলে দেখা দিও আবার, বুঝলে ?"

হিরোশিমা ঃ ভস্ম-সন্ততি

দেবেশ রায়

শুধুমাত্র একটি নাম নয়, হিরোশিমা আজ একটি প্রতীক। প্রতীক: মানুষের চরম মূঢ়তা ও অবিনশ্বর শপথের। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগস্ট সকালে হিরোশিমা ইতিহাসে সেই মর্যাদা পেয়েছে; সুমের, আক্কাড, ব্যাবিলন, হরপ্পা, এই সকল নাম ইতিহাসের এক-এক পর্বের পরিণামকে ও শিক্ষাকে অঙ্গীকার করে যেমন মর্যাদা পেয়েছে।

গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে সেই সকল ব্যক্তিকে যাঁরা এখনও মানববাদী হওয়ার সাহস রাখেন। আলবেয়ার কামুর একটি বক্তৃতার একটি বাক্যকে ধ্রুপদ হিসেবে উৎসর্গপত্রে উদ্ধার করা হয়েছে—"আমাদের ইতিহাসে ক্রিয়াশীল মৃত্যু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আর একবার প্রকাশ্য যুদ্ধ করবার জন্য পুণর্জাত হওয়ার অভিপ্রায়ে, প্রলয়কালে নিজেদের জন্য একপ্রকার জীবনযাপনের শিল্প তাদের বের করে নিতে হয়েছিল।"

গ্রন্থটি পড়বার পর কিন্তু প্রথম বাক্যটিই ধ্রুবপদ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। মনে হয়, লেখক নিজেই সেই দিনগুলির কথা বলতে বলতে মনুষ্যত্বে নিজের বিশ্বাসকে একেবারে অটুট রাখতে পারছিলেন না। হাত থেকে বিশ্বাসের পাত্র পড়ে গেছে, আঁচড় পড়েছে পাত্রের গায়ে, মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ হয়েছে জীবনের পাত্রে—তারপর লেখক সে পাত্রটিকে নিজের ওষ্ঠের কাছে তুলে ধরেছেন। আর সেহেতু এ-গ্রন্থে হিরোশিমা যখন শপথের প্রতীক, তখন পাশুপাত অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, মৃত্যুকে আক্ষরিক অর্থে পেরুনো, সেই প্রতীক আমাদের সকলের চেয়ে আপন, সকলের চেয়ে নির্ভরযোগ্য আত্মীয় হয়ে ওঠে। 'মনুষ্যত্ব' একটি ভাববাদী শব্দ আর থাকে না বা রোম্যান্টিক উচ্ছ্বাস।

বস্তুত গ্রন্থের উৎসর্গপত্রেই লেখক সমস্ত গ্রন্থের মূল কথাটিকে ধরে,

Children of the Ashes (The Story of a Rebi th) Robert Jungk. Heinemann. 25 Sh.

দিয়েছেন। এ গ্রন্থের বিষয়—আণবিক বোমায় হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন মূল্যবোধগুলি কী করে চুরমার হয়ে গেল, আর কী করে সেই মূল্যবোধ পুনরুপার্জনের জন্য সংগ্রামী এক প্রকল্পের শুরু হলো। গ্রন্থের নাম 'ভস্ম-সন্ততি', কিন্তু, দ্বিতীয় নাম 'পুনর্জন্মের কাহিনী'। এই বিষয়কে তিনি গ্রন্থের নামে ও উপনামে, উৎসর্গে ও উদ্ধৃতিতেও সংকেতিত করেছেন।

গ্রন্থকার য়ুঙ্ক (আন্দাজে উচ্চারণ লিখলাম) এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন যে, হিরোশিমা তাঁকে আবেগ ও ঘৃণার স্রোতে টেনে নিয়ে যাবে, কিন্তু তাতে তাঁর মুখ দিয়ে অভিশম্পাত বর্ষিত হবে, এ গ্রন্থ কোনো বার্তা বহন করবে না। তাই তৎকালীন পত্রিকার সংবাদ, জীবিত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, সরকারী দলিল, আন্তর্জাতিক দলিল প্রভৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে সিদ্ধান্তে আসার সময় একটি ক্রিয়াপদের ব্যবহারে, বা, একটি বাক্যের গঠনে, বা, একটি প্রশ্নে—তিনি নিজের সমস্ত আবেগকে প্রকাশ করেন, ফলে তাঁর বক্তব্য পাঠককে বাস্তব অবস্থার একেবারে সম্মুখে নিয়ে যেতে সফল হয়। যেমন:

"বোমা পড়ার অনেকদিন আগেই এগারো বৎসরের কম বয়সী ছেলে-মেয়েদের তাদের স্কুল শিক্ষকদের সঙ্গে দূরের গ্রামগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যখন এই ভয়ঙ্কর সংবাদ সেই গ্রামগুলিতে পৌছল, বয়স্করা বাচ্চাদের কানে যাতে এ সংবাদ না যায় তার চেষ্টা করলেন। কিন্তু, শিগ্‌গিরই পার্বত্য ও সমুদ্রোপকূলস্থিত গ্রামগুলিতে 'আণবিক নরকের' উদ্বাস্তুর ভীড় এত বেড়ে গেল যে, স্কুলের ছেলেমেয়েদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হলো: যে-শহরকে তারা এখনো 'দেশ' বলে ভাবে, সেখানে নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু হয়েছে।

"...কিন্তু অধিকাংশ শিশু বৃথা অপেক্ষা করছে। তারা স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন তারা রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত বা হিরোশিমা যাবার পথে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, এই আশায় যে, তাদের প্রিয়জন হয়তো আসবে।

"অবশেষে, কিছু ছেলে, বলা বাহুল্য সবচেয়ে সাহসী, ধৈর্য হারাল। তারা নিজেরা বাবা-মায়ের সন্ধানে নগরে যাবে স্থির করল। অন্যেরা তাড়াতাড়ি তাদের অনুসরণ করল। এবং শেষে মেয়েরাও আর বসে থাকতে রাজি হলো না। পায়ে হেঁটে, ট্রাক ধরে, চোরাই সাইকেল চেপে, বা ট্রেনে বিনা-টিকিটে চড়ে, তারা ধ্বংসস্তূপে ফিরে আসতে পারল।

"কিন্তু মাত্র কিছু ছেলেমেয়ে তাদের মা বাপকে ফিরে পেল। হিরোশিমার ছয় হাজার—কোনো কোনো মতে এমন কি দশ হাজার শিশু এই ঘটনায় তাদের মা বাবাকে হারিয়েছে। সুতরাং, এখন, তারা নিজেদের পথ বেছে নিতে অগ্রসর হলো"—(৬৮-৬৯ পৃঃ)। এর আগেই কিন্তু শ্রীযুক্ত যুঙ্ক বলে নিয়েছেন: "চুগোকু শিমবুন[1]-এর পুরনো ফাইলে দেখা যায় এই সময় একটি নতুন দুর্ভাবনা হিরোশিমায় গোচরীভূত হলো। জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক অধোগতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হলো। প্রায় প্রতিদিন খুন রাহাজানি বলাৎকার ছেনতাই এইসব খবর আসতে লাগল। এমন কি কাঠের তৈরি অত্যন্ত জরুরি চিঠির প্রথম বাক্সগুলি বসানোর সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে নিয়ে গিয়ে, জ্বালানি হিসেবে পোড়ানো হতো। অবশেষে, ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে এই সংবাদপত্র ক্রম-উর্দ্ধ অপরাধ-তরঙ্গের ভয়াবহ ঘটনা বর্ণনা করে ব্যাখ্যার চেষ্টা করল:

"নভেম্বর মাসে প্রাপ্ত, হিরোশিমা ও প্রতিবেশী অঞ্চলের অপরাধ সংখ্যা, ইতিমধ্যেই সমগ্র যুদ্ধকালের অপরাধ সংখ্যার সমান।......সংবাদপত্রগুলি প্রাক্তন সামরিক কর্তা, শাসনকর্তা, নগরকর্তা ও অফিসকর্তাদের ব্যর্থতার খবর প্রকাশ করেছে। ফলে, গতকালের নেতাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণার তরঙ্গ প্রবাহিত হয়েছে। আজকের অপরাধমূলক কার্যকলাপের কৈফিয়ৎ হিসেবে এই কারণ দর্শানো হয়...বলা হয়: প্রাক্তন শাসকশ্রেণী তার রাজনৈতিক ও সামরিক অধিকার তছরুপ করেছে; সুতরাং আজ আমাদের চুরি করার অধিকার।" (পৃঃ ৬৭)

এই হচ্ছে লেখকের পদ্ধতি। একই সঙ্গে পরপর দুটি অনুচ্ছেদে তিনি যথাক্রমে বাস্তব ক্ষতির তালিকা ও মানসিক ক্ষতির তালিকা পেশ করেন। দীর্ঘশ্বাস বা অভিসম্পাতের সীমা আছে। এই সর্বনাশের সমান ওজনের আবেগ প্রকাশ প্রায় অসম্ভব। তাই শ্রীযুক্ত যুঙ্ক একেবারে প্রায় নিরাসক্ত তথ্য-সংগ্রাহকের ভঙ্গি নিয়েছেন। ফলে একদিকে যেমন তাঁর গ্রন্থ শুধুমাত্র "মানসিক সর্বনাশের" পরিচায়ক আরো কতকগুলি জাপানি বা আমেরিকান রচনা থেকে পৃথক হয়েছে, তেমনি, অপর দিকে "বাস্তব ক্ষয়-ক্ষতির" দরকারী নিষ্প্রাণ তালিকা থেকে স্বতন্ত্র হয়েছে।

---

[1] আণবিক বোমা পড়বার পর ঐ অঞ্চলের প্রথম পুনর্প্রকাশিত সংবাদপত্র। ৩১ আগস্ট '৪৫

হিরোশিমা সম্পর্কে আমেরিকান আচরণ ও আমেরিকার প্রতি হিরোশিমা-বাসীর আচরণ লেখক বাস্তব নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। ৬ই আগস্টের তিনদিন পর থেকেই জাপানি ডাক্তাররা আণবিক অসুস্থতার কারণ ও চিকিৎসাপদ্ধতি নির্ণয়ের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। চুতা তামাগোয়া, সিসি ওহাসি, হাচিয়া, মাসাও ৎসুজুকি প্রভৃতি জাপানি চিকিৎসকগণ আণবিক বোমার ফলে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের মারাত্মক অসুস্থতার চিকিৎসা আবিষ্কারে দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করেছিলেন কিন্তু সামরিক কর্তাদের নির্দেশে তাঁদের মাঝপথে থেমে যেতে হয়েছে, রিপোর্ট প্রকাশ সম্ভব হয় নি, এমন কি শবব্যবচ্ছেদের অধিকার পর্যন্ত তাঁদের দেওয়া হয় নি। শুনলে আশ্চর্য হতে হয় আণবিক রশ্মির সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষক মাসাও ৎসুজুকি তাঁর চিকিৎসক বন্ধুদের কাছে শরীর অভ্যন্তরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর আয়নকারী রশ্মির প্রভাব ব্যাখ্যা করতে, তথাকথিত বিষ-বাষ্পের প্রভাবের উপমা ব্যবহার করেন বলে দখলকারী আমেরিকান শাসকগোষ্ঠী দ্বারা অভিযুক্ত হন এবং ১৯৪৭ সালে বরখাস্ত হন। শুনলে আশ্চর্য হতে হয়: আণবিক বোমা পড়ার পরপরই জাপানি সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'দোমি'-র প্রতিনিধি কাতাসিমা তাঁর নিহত পিতামাতার অস্থিগুলি ব্যাগে পুরে ছুটে ছুটে সংবাদ সংগ্রহ করে; কোথাও কবর দেওয়ার জায়গা ছিল না, "তিনি জাপানি ডাক্তারদের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসস্তূপে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন আর পিঠের ওপর বাক্সের মধ্যে তাঁর বাবা মার টুকরো টুকরো হাড় ঝন্ ঝন্ করে বাজত"—(প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, পৃঃ ৩৮)। এই নতুন অসুস্থতার সংবাদ লিসবনে পাঠাতে একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে মাত্র দু-একদিন দেরি করেছিলেন বলে, পৃথিবীর কেউ কোনোদিন আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ঠিক পরবর্তী অসুস্থতা সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারল না, কারণ 'দোমি' সংবাদ প্রতিষ্ঠানের কাজের ওপর বিস্ফোরণের কয়েকদিনের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল বিজয়ী পক্ষের সদরদপ্তর থেকে, আর সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠানটিকে একেবারে ভেঙে দেয়া হলো। শুনলে আশ্চর্য হতে হয়: দখলকারী সেনাদল হিরোশিমায় আসার আগে তাঁদের আপ্যায়নের জন্য ও তাঁদের হাত থেকে কুলবধূদের বাঁচাতে হিরোশিমার শ্মশানে বেশ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। আণবিক বোমা বিস্ফোরণের মাত্র চোদ্দ দিন যেতে না যেতেই ছোট ছোট লঞ্চ দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে পাঁচশত মেয়ে সংগ্রহ করল। এদের মধ্যে খুব কম অংশ এই পেশার অন্তর্গত। অধিকাংশকেই তাঁদের

বাবা-মা বেচে দিয়েছিল। এক হিরোশিমা থেকেই আরো দুইশত মেয়ে সংগৃহীত হয়েছিল। সেই কঙ্কালাকীর্ণ ও আর্তনাদ-ছিন্ন শ্মশানে দশটি গণিকালয় স্থাপিত হলো একমাসের মধ্যে। আর যেদিন অষ্টম সেনাবাহিনীর ৩৪তম পদাতিকদল হিরোশিমায় পদার্পণ করল, গণিকালয়গুলিকে আলোক-সজ্জিত করে তাদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। শুনলে আশ্চর্য হতে হয়—অ্যাটমিক বোম ক্যাজুয়ালটি কমিশনের বিরুদ্ধে জাপানে এই মনোভাব গড়ে উঠেছিল যে, আণবিক বোমা ফেলে মানুষের শরীরে তার প্রতিক্রিয়া দেখে পরবর্তী যুদ্ধে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই আমেরিকানরা এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে বলেই এখানে গবেষণা আছে, চিকিৎসা নেই। এবং তারা সমবেত কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছিল "আমরা গিনিপিগ হব না।" আর আমেরিকানদের আণবিক অসুস্থতার চিকিৎসার বিরুদ্ধে এই স্থির কার্যকলাপ দেখে ডাঃ মাৎসুমোতো সিদ্ধান্তে এসেছেন—"এই কমিশন কোনোপ্রকার প্রায়শ্চিত্তের মনোভাব সৃষ্টি করতে প্রস্তুত নয়।" এই কারণেই আণবিক বোমার ফলে বিধ্বস্ত হিরোশিমা সম্পর্কে আমেরিকান সরকার কোনো সময় কোনো বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজি হয় নি। এবং ১৯৪৫-এর অক্টোবরে দখলকারী সেনাদলের প্রবেশের পর কেউ ভ্রমক্রমেও আমেরিকানদের দায়ী করতে সাহসী হতো না। তাই, নিহত অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত স্মৃতিস্তম্ভে শুধু লেখা আছে "শান্তিতে বিশ্রাম করো। আর ভুল হবে না।" কিন্তু সেই স্মৃতিস্তম্ভ উন্মোচনের সভাতেই জনৈক নিষ্ঠাবতী খ্রীষ্টান আমেরিকান মহিলা চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—"অন্তত একটি সত্য কথা বলার দিন আজ এসেছে যে, হিরোশিমায় আণবিক বোমা ফেলে আমরা অমানুষিক অপরাধ করেছি।" শুনলে আশ্চর্য হতে হয়—দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন দমনের জন্য জাপানি সরকার একটি জনশৃঙ্খলা আইন পাশ করে, কিন্তু তা প্রয়োগের অধিকার থাকে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের। হিরোশিমার জনদরদী মেয়র এ আইন প্রয়োগ করতে অসম্মত হন বলে দখলকারী আমেরিকান সেনাদলের প্রধান দপ্তর কুরেতে ডেকে নিয়ে তাঁকে ভৎর্সনা করা হয়। শুনলে আশ্চর্য হতে হয়, আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর পাঁচ বৎসরও উত্তীর্ণ হওয়ার আগে এই হিরোশিমাই কোরিয়া যুদ্ধে আমেরিকান সেনাবাহিনীর একটি প্রধান ঘাঁটিতে রূপান্তরিত। শুনলে আশ্চর্য হতে হয়, আজকের হিরোশিমার প্রধান আয়: আমেরিকান অস্ত্র-শস্ত্রকে জাপানি সৈন্যের উপযুক্ত করে

পরিবর্তিত করার ও আমেরিকা থেকে পাঠানো বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্রের টুকরো অংশ জোড়া লাগানোর কারখানা থেকে।

সোভিয়েত রাশিয়া সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত য়ুঙ্কের মনোভাব ঠিক বোঝা গেল না। বার তিনেক তিনি অর্ধ-স্পষ্টভাবে সোভিয়েত রাশিয়াকেও বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠী রূপেই বর্ণনা করতে চেয়েছেন। যুদ্ধোত্তর জাপানে শ্রমিক আন্দোলন সুরু করেছিল কম্যুনিস্ট পার্টি, সারা পৃথিবীতে যে-শান্তি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে তার প্রধান সমর্থক সোভিয়েত রাশিয়া—এ-সব কথা সত্যসন্ধ ঐতিহাসিকের মতো স্বীকার করেও, এমন কি পৃথিবীর প্রথম আণবিক বিস্ফোরণ সাহায্য ভাণ্ডার যে গড়ে উঠেছিল সোভিয়েত রাশিয়ারই চেষ্টায় ও নেতৃত্বে—একথা স্পষ্টভাবে বলেও সম্ভবত সকল শ্রেণীর ও মতের বিবেকবান মানুষের কাছে নিজের বক্তব্য পৌছে দিতেই নিজেকে সকল দলমতের উর্ধ্বে মানবতাবাদী বলে প্রমাণ করার প্রয়োজন হয়েছে। শ্রীযুক্ত য়ুঙ্ক সত্যই মানবতাবাদী। তাই তিনি সোভিয়েত রাশিয়া সম্বন্ধে নীরবতা, ও বারকয়েক অস্পষ্টভাবে দোষারোপ—এ-ছাড়া কিছু করেন নি। এতে অবিশ্যি আমি তত দোষ দেখি না। কারণ এ বই সেই যুদ্ধবিরোধী শান্তির কথা বলে, যার আহ্বান প্রথম জানিয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়া। নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও বৃহত্তর সুখশান্তি একমাত্র কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রই চাইতে পারে। খানিকটা অকারণ নিন্দা আছে জেনেও যে-কোনো কম্যুনিস্ট এ বইকে অভিনন্দিত করবেন এই কারণে যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জঘন্যতম অপরাধের কাহিনী এখানে বিবৃত হয়েছে।

তবে মতাদর্শের দিক থেকে শ্রীযুক্ত য়ুঙ্ক ব্যক্তিবাদী। তাঁর বই উৎসর্গ করা হয়েছে মানবিকতাবাদী ব্যক্তিগণকে। তাঁর গ্রন্থের অনেক চরিত্র, পৃথক পৃথকভাবে ও স্ব স্ব পথে এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন। এবং ব্যক্তিগত প্রায়শ্চিত্তই যে পদস্খালনের একমাত্র পথ এমন ইঙ্গিতও অনেকবার আছে। হিরোশিমার নতুন নগরপাল সিঞ্জো হামাই, আণবিক বিস্ফোরণের পর হিরোশিমায় এসে আণবিক ধ্বংসের নজির সংগ্রাহক ও বর্তমানে আণবিক যাদুঘরের অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ শোগো নাগাওকা, আমেরিকার নর্মান কাজিন্‌স্‌, আমেরিকার কতিপয় ডাক্তার যাঁরা আমেরিকান নির্দেশ অমান্য করে জাপানি মেয়ে বিয়ে করে জাপানেই থেকে গেছেন—এঁদের প্রত্যেকে নিজস্ব পথে, নিজস্ব শক্তিতে হিরোশিমার পুনর্জন্ম সাধন করেছেন।

সর্বোপরি আছে ইকিরো কোয়ামোতো, টকি উয়েমাৎসু, কাজুয়ো এম⋯।

এঁরা এই বইয়ের নায়ক নায়িকা। কোয়ামোতো সেই ব্যক্তি যে আণবিক বিস্ফোরণের পর পাপবোধের তাড়নায় নিজের দেহমনপ্রাণ সমর্পণ করেছিল আর্তের সেবায়, যে একটি অনাথ শিশুকে রক্ষণাবেক্ষণ বা একটি রোগার্ত মানুষের সঙ্গে গল্প করার সময়ের জন্য যুদ্ধোত্তর বেকার-সমস্যা-কাতর জাপানেও নিশ্চিত স্থায়ী চাকরি ছেড়ে দেয়—এবং যে হিরোশিমায় প্রথম একটি মেয়েকে, দেহের দিক থেকে নয়, মনের দিক থেকে, ভালোবাসল। এই শ্মশানের মধ্যে কোয়ামোতো ও উয়েমাৎসুর ভালোবাসার কাহিনী যে বাস্তবনিষ্ঠা ও মানবিকতা নিয়ে লেখক বর্ণনা করেছেন, তাতে সত্যি সত্যি মাঝেমাঝে শিহরিত হতে হয়। তারপর, বিয়ের সময়েও যখন তারা প্রতিজ্ঞা করে—আমরা কোনো ছেলেমেয়ের জনক-জননী হব না, যদি তারা আণবিক রোগগ্রস্ত হয়ে জন্মায় —তখন হিরোশিমার সঙ্কট মানবতার সঙ্কটে রূপান্তরিত হবে।

কাজুয়ো এম···সেই ব্যক্তি যে আণবিক বিস্ফোরণের পর সনাতন মূল্যবোধ নিয়ে ধ্বংসের বিরুদ্ধে বাঁচতে চেয়েছে, কিন্তু জাপানের সামগ্রিক অধঃপতন তাকে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার চেষ্টায় প্রবৃত্ত করাল। সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর হত্যা-প্রবৃত্তি তার মধ্যে এত গভীরে প্রবেশ করল, যে, পটাশিয়াম সায়ানাইড ব্যবহার করে একেবারে নাবালক কিশোর অনভিজ্ঞ হত্যাকারীর মতো চারটি লোককে হত্যা করে বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল "আমি মৃত্যুদণ্ড চাই।"

কোয়ামোতো, উয়েমাৎসু ও কাজুয়ো এম-এর চরিত্র ধ্রুপদী উপন্যাসের চরিত্রের মতো করে লেখক সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এর একটিও যে তাঁর 'সৃষ্টি' নয় তার নজির হিসেবে কারাগারের দেয়ালে আঁকা কাজুয়ো এম-এর একটি অসাধারণ আত্মপ্রতিকৃতির প্রতিলিপি দিয়েছেন। স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই এই গ্রন্থ দলিল দ্বারা প্রমাণসাপেক্ষ ঘটনা ও মহৎ শিল্পবিষয়কে একই সঙ্গে প্রকাশিত করে অত্যন্ত বড় কীর্তি স্থাপন করেছে।

পরিশেষে বলা হয়েছে : এই গ্রন্থের লেখকও হিটলারের জেলে জীবনের মূল্যবান অনেকগুলি বছর খুইয়েছেন। তাই তিনিও নিজে 'Survivor' হিসেবে আহ্বান জানিয়েছেন : "...I know that we, the generation of those who 'got through', must devote our entire strength to ensuring that our children do not merely survive, as fortuitously as we did...only : this must be his most serious and even sacred task."

পুস্তক পরিচয়

রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান। বিমানবিহারী মজুমদার। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। ছয় টাকা।

সাহিত্যিক ঐতিহ্যের সঙ্গে শিল্পীদের সম্পর্ক সাহিত্যজিজ্ঞাসুদের আগ্রহের বিষয়। কিন্তু, কবিত্বের দুর্মর প্রেরণায়ই শিল্পী ঐতিহ্যের ধারায় তাঁর কবি-স্বভাবের স্বকীয়তাই কেমনভাবে পুষ্ট করে তোলেন, সে বিষয়ে সচেতন না থাকলে ঐ সম্বন্ধ-বিচার ঋণগ্রহণের ফিরিস্তিতে পর্যবসিত হতে বাধ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, গবেষক পণ্ডিতদের কৃপায় বোক্কাচ্চিওর কাছে চসরের কাহিনীগত ঋণের বহর আমরা জেনেছি। কিন্তু সে জ্ঞানে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের ইংরেজ কবির শিল্পমাহাত্ম্য বুঝতে আমাদের কিছুমাত্র সুবিধে হয় না। কাব্যের সৃষ্টিময়তায়ই ঐতিহ্যের যা কিছু তাৎপর্য লক্ষণীয় ; ভাষাভঙ্গি, ছন্দ, অলঙ্কার, পংক্তিগত খুচরো মিল, অথবা কবিকর্মের বিচার ছেড়ে বিশুদ্ধ ভাবগত সাদৃশ্য সন্ধানে নয়। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ শিল্পীর ক্ষেত্রে এ ধরনের সরলীকরণ অত্যন্ত বিপজ্জনক : রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের কবি নিশ্চয়ই, কিন্তু সরল বিশ্বাসের নিরঙ্কুশতায়, ব্রাহ্মণদক্ষিণার মতো তিনি এ দেশকে পাননি, নিজস্ব কবিস্বভাবের দ্বন্দ্বময় প্রক্রিয়ায়ই তাঁকে ভারতবর্ষ গড়তে হয়েছে।

দুর্ভাগ্যত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তো আমাদের কাছে অনেকটা পরিমাণেই একাকার জড়পিণ্ডবিশেষ, আর আমরা যখন তার চর্চায় উৎসাহী হই, তখন তাকে মন্ত্রপূত, ফেটিশ্ করে তুলি মাত্র। তাই তথ্য কিংবা তত্ত্বগত বিচারের ঐতিহাসিক আড়ম্বর বা দার্শনিক বিজ্ঞতা এখানে সহজেই শিল্পকর্মের মূল্যায়নের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। বিদেশের সাহিত্যরসিক পণ্ডিতেরা যখন প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তখন তাতে আমাদের কবিতার বোধ বিস্তৃত হয় বলেই জ্ঞানের দিকটিও যথার্থ গভীর হয়, কুরটিউস বা ক্সলর সাহেবদের ইওরোপের মধ্যযুগীয় সাহিত্যালোচনায় আমরা এভাবেই উপকৃত হই।

বৈষ্ণবশাস্ত্র ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে পদাবলীর স্থান' বইটিতে ঐ বিভ্রান্তির বিড়ম্বনায় রবীন্দ্রনাথের

শিল্পকর্মের প্রতি স্পষ্টতই অবিচার করেছেন দেখা গেল। রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের বিকাশে তাঁর বৈষ্ণবপদাবলীর চর্চা কতটা তাৎপর্যপূর্ণ, সে সাহিত্যজিজ্ঞাসার পটে তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর মূল্য নিরূপণ করেন নি, যান্ত্রিক সাদৃশ্য উদ্ধারেই তাঁর বিশ্লেষণকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। অন্যপক্ষে, পদাবলী সাহিত্যকে শিল্পকর্ম হিসেবে না দেখে একটি বিশিষ্ট ধর্মসাধনার অংশরূপে গ্রহণের মনোভাবই প্রকারান্তরে প্রকাশ করেছেন এবং বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথকৃত পদাবলীর ব্যাখ্যায় ও অন্যত্র সে ধর্মসাধনার বিধি যে কিভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে, সে বিষয়ে প্রতিপদে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভোলেন নি।

বইটির প্রথম দিকেই, চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের ঐক্য প্রতিষ্ঠাকামী চেষ্টায় রুষ্ট একদল লোক কলসীর কানা ছুঁড়ে মেরে তাঁর ক্ষতি করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র'-র সে উক্তিটি তুলে সমালোচক মন্তব্য করেন: "কবি পদাবলীসাহিত্য যেমন যত্নের সহিত পড়িয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যের জীবনী গ্রন্থগুলি তেমন ভাল করিয়া পড়েন নাই। পড়িলে, নিত্যানন্দের মারখাওয়ার কথা শ্রীচৈতন্যে আরোপ করিতেন না।" রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির মর্মানুসন্ধানের সূত্রে বৈষ্ণবপদাবলীর ঐতিহ্য বিশ্লেষণের বদলে বহিরঙ্গ তথ্যেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার দরুণ কবির নিতান্তই আলঙ্কারিক উক্তিটি তাঁর কাছে এমন বিচ্ছিন্ন, তাৎপর্য-হীন গুরুত্ব পায়। কিছু পরেই লেখক বলেন, কবি বৈষ্ণবদর্শন, জীবনচরিত বা প্রার্থনা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা জাতীয় উপাসনাগ্রন্থের মতবাদ মেনে নিতে পারেন নি। 'পদাবলীর মাধুর্যবিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়ে কবির পদাবলী ব্যাখ্যার চমৎকারিত্ব স্বীকার করেও তাঁর বৈষ্ণবধর্মবিধি লঙ্ঘনের প্রতিটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে লেখক উৎসুক। জ্ঞানদাসের পদের ব্যাখ্যা সম্পর্কে এই উক্তিটি পাই: "জ্ঞানদাসের পদের মধ্যে এ ধরনের কোন কথা যে আছে তাহা সাধারণ পাঠকের চোখে পড়ে না" এবং এ ব্যাখ্যা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রবর্তিত ভজনপ্রণালীর বিরোধী। "তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি" বলরাম দাসের এই পদটির রবীন্দ্রনাথকৃত বিশ্লেষণকে "অচিন্তিত-পূর্ব ব্যাখ্যা" আখ্যা দিয়ে বিমানবাবু বলেছেন যে অদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাখ্যাও নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবেরা মেনে নিতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'পদরত্নাবলী'র পদবিন্যাসরীতি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য এই:

গৌরাঙ্গলীলাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা পদাবলীর আধ্যাত্মিক রহস্যের চাবিকাঠি বলে মনে করেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে লীলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা বাসুদেব ঘোষের একটি পদকেও স্থান দেন নি। 'পদরত্নাবলী'র পদসন্নিবেশের মাধুর্য থাকলেও দু-একটি জায়গায় লীলার বিধিসম্মত পৌর্বাপর্য রক্ষিত হয় নি। খণ্ডিতা ও কলহান্তরিতার পদ রবীন্দ্রনাথ ধরেন নি, কারণ, "শ্রীকৃষ্ণের বহু-বল্লভত্ব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র পছন্দ করিতে পারেন নাই।" রবীন্দ্রনাথের 'বিদ্যাপতির রাধিকা' প্রবন্ধটির ত্রুটি সন্ধানই সব থেকে বিস্ময়কর: "রবীন্দ্র-নাথ বিদ্যাপতিকে সুখের কবি বলিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে বিদ্যাপতি বুঝি তাঁহার অল্প বয়সেই সকল পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন—"বিদ্যাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা এবং চণ্ডিদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে।" কিন্তু এখন তাঁহার ভণিতাংশে মিথিলার রাজা ও রাজপুরুষদের উল্লেখ হইতে দেখা যাইতেছে যে তিনি রবীন্দ্রনাথেরই ন্যায় সুদীর্ঘকাল ধরিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন।" বিদ্যাপতির পদাবলীতে রাধার যৌবনবিলাস যে ভাবে ফুটেছে, তা-ই রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন, কবির বয়স নিয়ে কোথাও মাথা ঘামান নি! ওটা বিদ্যাপতির নিজস্ব কবিস্বভাবের প্রবণতার বিষয়, তাঁর বয়সের ব্যাপার নয়।

রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবপদাবলীকে শুধু সাহিত্যের দিক থেকেই গ্রহণ লেখক নিজেই যখন বহুবার উল্লেখ করেছেন, তখন বৈষ্ণবধর্মমতের সঙ্গে কবির বিরোধ প্রদর্শনে এই প্রযত্ন অস্বস্তিকর লাগে। নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবেরা রবীন্দ্রনাথের পদাবলীর ব্যাখ্যা মানতে পারেন কি পারেন না, সে প্রশ্ন কি তাঁর সাহিত্যিক মূল্যবোধ এবং সৃষ্টির ক্ষেত্রে খুব প্রাসঙ্গিক? রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন বৈষ্ণবপদাবলীর চর্চা যে লেখকের বিশেষ মনঃপূত হয় নি, সামান্য একটু সতর্ক পাঠকের কাছেই সেটা ধরা না পড়ে পারে না। অন্য কোনও কারণে নয়, রবীন্দ্রনাথ কবি বলেই 'পদকল্পতরু'র প্রাণহীন কনভেনশন মানেন নি, এবং ঐ কনভেনশন পাকাপোক্ত হওয়ার আগেই যা কিছু শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-পদাবলী রচিত হয়ে গিয়েছিল। অজস্র অক্ষম, অনুকরণসর্বস্ব আলঙ্কারিক পদের তুচ্ছতার মাঝখানে মানবিকরসসমৃদ্ধ যে সমস্ত বৈষ্ণবপদ মেলে তাদের আশ্চর্য প্রাণময়তায় বৃন্দাবনের গোস্বামীবৃন্দ ও অন্যান্য বৈষ্ণব পণ্ডিতদের রসতত্ত্ব অপেক্ষা বোধহয় চৈতন্যদেবের জীবনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষপ্রেরণা এবং 'সদুক্তি কর্ণামৃত', 'অমরুশতক', 'প্রাকৃতপৈঙ্গল', 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়',

'গাহাসত্তসঈ' প্রভৃতিতে সঙ্কলিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত-অপভ্রংশ প্রেমকবিতার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের প্রভাব অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাব্যের যোগ যখন প্রত্যক্ষ থাকে, তখনও শিল্পের ক্ষেত্রে কবিকে কোনও-ক্রমেই তথাকথিত নৈষ্ঠিক ধর্মসাধক হলে চলে না। সেণ্ট টমাস একুইনাসের কাছে দান্তের 'ঋণ' উল্লেখযোগ্য হলেও তাঁর কাব্য ঐ খ্রীষ্টীয় সন্তের তত্ত্বের নিখুঁত ছাঁচে ঢালাই জিনিস নয়, নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টানেরা সেজন্য ক্ষুব্ধ হলেও কাব্যপাঠকদের অশান্তির কোনও কারণ ঘটে নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৈষ্ণব কবিতায় লেখকের ধারণামতো বৈষ্ণব সাধনার সঙ্গে তাঁর বিরোধকে প্রকাশ করেন নি, শিল্পের ঐ সত্যকেই রূপায়িত করেছেন।

আসলে বিমানবাবু ব্যক্তিগত পক্ষপাত ছাড়া আলোচনার কোনো নিরিখই স্থির করতে পারেন নি বলে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্যহীনতার পরিচয় সুস্পষ্ট। কোনও নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ এবং তৎসঞ্জাত সুশৃংখল বিচারবিশ্লেষণের পদ্ধতির অভাবে আমাদের অ্যাকাডেমিক সাহিত্যালোচনা যে কত বিশৃংখল হতে পারে, 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে পদাবলীর স্থান'-এ তার অনেক প্রমাণই মেলে।

রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে পদাবলীর স্থান নির্ণয়ে লেখক বলেন, কবি প্রথমে বৈষ্ণব পদাবলীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে অনুকরণ করেন, পরের ধাপে পদাবলীর অনুসরণে বহু কবিতা-গান রচিত হয়, তৃতীয় স্তরে এই সাহিত্যের অন্তর্নিহিত কান্তভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু কবিতা-গান সৃষ্টি করেন, তারপরেই তাঁর রচনায় পদাবলীর বিলীয়মান প্রভাব লক্ষণীয়। অনুকরণের প্রথম পর্ব, অর্থাৎ 'পদকর্তা রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়টির উপজীব্য 'ভানু সিংহের পদাবলী': রবীন্দ্রনাথের সমগ্র শিল্পকর্মের বিচারে তুচ্ছ এই রচনাটির জন্যেই প্রায় তের পাতা ব্যয় করতে হয়েছে। প্রথম দিকে সমালোচক আমাদের জানান, 'ভানুসিংহের পদাবলী'র অন্তর্গত একটি পদে ভানুসিংহ রাধাকে অভিসার থেকে নিবৃত্ত হবার জন্য যেভাবে নিষেধ করেন, কোনও বৈষ্ণব কবির পক্ষে তা অকল্পনীয়। বিশুদ্ধ কাব্যরসের দিক দিয়ে 'ভানুসিংহের পদাবলী'র শেষ দুটিকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পদ বলেছেন বিচারবিশ্লেষণ ছাড়াই, আবার একই সঙ্গে রাধিকার ভাববিশ্লেষণে ষোড়শ সংখ্যক পদটিকে পদাবলী সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন বলে নির্দেশ করেছেন! তাঁর রুচিগত ঝোঁক যে কোন্ দিকে, তার আর একটি ইঙ্গিত অনুধাবনীয়। ষোড়শ সংখ্যক

পদটি সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসের পর তিনি লেখেন: "এখন প্রশ্ন হইতেছে যে যে-গ্রন্থে এমন সুন্দর পদ আছে তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে এত সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন কেন? তাহার কারণ তিনি বৈষ্ণব সাধনাকে, রাধাকৃষ্ণের যুগল মধুর রসের উপাসনাকে নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারেন নাই।" তাহলে নিছক অনুকরণেই রাধিকার ভাববিশ্লেষণের অমূল্য পদরচনা সম্ভব? এর আগেও তো কবির কুণ্ঠার কারণের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: "তিনি পদাবলীর ভাষা ও আঙ্গিককে নকল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবীয় ভাবানুভূতিকে নিজের সাধনার দ্বারা আপনার করিয়া লইতে পারেন নাই।"

'ভগ্নহৃদয়'-এ রবীন্দ্রনাথ পদাবলীর উপজীব্য পরকীয়া প্রেমের মর্মকথাই চপলার মুখে বসিয়েছেন এবং এই কাব্যের নলিনীর একটি উক্তি গোবিন্দদাসের পদানুসরণেই রচিত, 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র "রিম্‌ঝিম্ ঘন ঘন রে বরষে" গানটি জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের বর্ষার পদের অনুসরণের ফল, রবীন্দ্রনাথ 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট'-এর বসন্ত রায়ের মুখে খণ্ডিতার পদ দিয়েছেন এবং 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' এ কৃষকদের কণ্ঠে গোষ্ঠের গান লাগিয়েছেন, 'কড়ি ও কোমল'-এর কয়েকটি কবিতায় পদাবলীসুলভ বাঁশি বাজানো ও বাঁশির সুর শ্রবণজাত আকুলতা প্রকাশিত, পদাবলীর বিরহ কবিতার সঙ্গে 'মায়ার খেলা'র বিরহ বেদনার মিল, 'মানসী'র 'একাল ও সেকাল'-এ মানুষের মনে বৃন্দাবনলীলার মায়ার প্রভাব প্রদর্শন, 'রাজা ও রাণী' নাটকে ইলার সখীদের ("ঐ বুঝি বাঁশি বাজে") পদাবলীর ভাষায় গান, 'কল্পনা'র 'স্পর্দ্ধা' কবিতার সঙ্গে "শ্রীরাধার রসোদ্গারের পদাবলীর কিছু সাদৃশ্য," জীবন দেবতাকে প্রথমে প্রিয়া রূপে উপলব্ধি করলেও শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণব সাধকের মতো কবির নিজেকেই তার প্রেম পাত্রী রূপে দেখা—প্রাক্-'গীতাঞ্জলি' যুগের কাব্যে যান্ত্রিকভাবে পদাবলীর প্রভাবের এই যে সমস্ত দৃষ্টান্ত লেখক (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের গৌণ কবিতাগুলিতে) প্রদর্শন করেছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাবের জটিল বিকাশের সমগ্রতা বুঝতে তা আমাদের কিছুমাত্র সাহায্য করে না, অর্থাৎ এই "প্রভাবের" স্বরূপ নির্ণয়ের কোনও দায়িত্বই তিনি গ্রহণ করেন নি।

এই ধরনের বিচ্ছিন্ন প্রভাব অন্বেষণের আগ্রহাতিশয্যে আক্ষরিক অর্থের ওপর নির্ভর করে পণ্ডিতব্যক্তিরাও মাঝে মাঝে বিচারবিভ্রাটে আমাদের সত্যি বিমূঢ় করে তোলেন। 'প্রাক্-গীতাঞ্জলি যুগের কাব্যে পদাবলীর প্রভাব'

অংশে লেখক 'ক্ষণিকা'র 'জন্মান্তর'র কবিতার ব্যাখ্যায় বলেছেন: কবি এখানে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব সাধকের মতো প্রার্থনা করছেন যেন পরজন্মে তিনি ব্রজের রাখাল বালক হতে পারেন। এই কি বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবের নমুনা? রবীন্দ্রনাথের এই লঘু চালের কবিতায় ঈস্‌থেটিক সংবেদ্যতা, সৌন্দর্য রুচির প্রয়োজনেই বৈষ্ণবপদাবলীর চিত্রগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, বৈষ্ণব সাধকের প্রার্থনার সঙ্গে তার ক্ষীণতম সাদৃশ্যও নেই। রাখাল বাঁশি ইত্যাদি শব্দ পেলেই সমালোচক বৈষ্ণব প্রভাব খোঁজেন। 'পদাবলীর বিলীয়মান প্রভাব' অংশে আছে: 'পূরবী'র তপোভঙ্গ কবিতার "কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙ্গা বাজে" এই অংশটি কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার অনুসরণে রচিত। প্রভাবসন্ধানী পাণ্ডিত্যের পরিবর্তে আলোচ্য কবিতাটিকে কবিতা হিসেবে পড়লেই যে কোনও পাঠক বোঝেন যে মহাদেবের রুদ্ররূপের সৃষ্টিময়তার যে প্রতীকী বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটিকে বেঁধেছেন, তাতে কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা আসার সুদূরতম সম্ভাবনাও ছিল না! 'রক্তকরবী'র নন্দিনীর মুখের "ভালোবাসি ভালোবাসি / এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি" এই গানে শুধু বাঁশি শব্দটির সূত্রেই বৈষ্ণব প্রভাবানুসন্ধানও কম বিচিত্র নয়।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদারের মতে, 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি' রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম উপলব্ধির সুবর্ণময় যুগ এবং এর পেছনে আছে পদাবলীর কান্তভাবের অনুপ্রেরণা। সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের পটে 'গীতাঞ্জলি'র সাহিত্যিক নির্ধারণের প্রশ্নটি ছেড়ে দিয়ে নিছক প্রভাবের দিকটি ধরতে গেলেও আমাদের সংশয় ঘোচে না। বৈষ্ণব পদাবলীর ভিত্তি বৈষ্ণবধর্ম-সাধনার সঙ্গে যে কবির বিরোধ সমালোচক এতবার উল্লেখ করেছেন, নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সঙ্গে বৈষ্ণবীয় মাধুর্যরস মেলাতে পারেন নি বলেছেন, সেই কবির ধ্যানে কান্তভাবের প্রভাব যে কি ভাবে পড়তে পারে বোঝা সত্যি কঠিন। 'গীতাঞ্জলি'-'গীতালি'র মাহাত্ম্য যতই থাকুক, তাঁর শেষ বিচারে—"গীতাঞ্জলি-গীতালির কবিকে বৈষ্ণব বলা চলে না।" গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সাধ্যসাধনের নিক্তিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে ওজন করলে হয়তো তা "অনেক পরিমাণে হাল্কা" বোধ হতে পারে, কিন্তু আধুনিক মানুষের কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্যে 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-গীতালি' এমন এক "স্বর্গীয় সুধা" পরিবেশন করে যা পান করলে দিব্যানুভূতির শক্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়।

'পদাবলীর বিলীয়মান প্রভাব' অংশের একটি উক্তি চূড়ান্ত বিচারহীন

প্রগল্‌ভতায় একেবারে মারাত্মক। সমালোচক 'চতুরঙ্গ'-এ শ্রীবিলাসকে দামিনীর বরণের তাৎপর্য অনুধাবনের কিছুমাত্র চেষ্টা না করেই অবলীলাক্রমে মন্তব্য করেন: "দামিনী শচীশের সাধনার বিঘ্ন ঘটাইবে না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া নিজেকে প্রলোভনের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য শ্রীবিলাসকে বিবাহ করিল। এখানে পদাবলী সাহিত্যের পরকীয়া প্রেমের যেন ডিগ্‌বাজি খাওয়ান হইল। রাধা বিবাহিতা বটে কিন্তু তাঁহার স্বামীর সঙ্গে তাঁহার কোন দৈহিক বা মানসিক সম্বন্ধ নাই; গোবিন্দদাসের মতে তিনি গৃহপতি মাত্র, প্রাণপতি নহেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শেষ সাতাশ বৎসরে লিখিত অনেকগুলি গল্পে ও উপন্যাসে দেখাইয়াছেন যে নারী প্রাণ দিয়া একজনকে ভালবাসে, কিন্তু বিবাহ করে অন্যকে। রাধাকে অল্প বয়সে আত্মীয়স্বজন বিবাহ দিয়াছিল, বিবাহ ব্যাপারে তাঁহার কোন মতামত ছিল না। আর চতুরঙ্গের দামিনী, শেষের কবিতার লাবণ্য, বাঁশরীর সুষমা প্রভৃতি একজনের সঙ্গে প্রেম করিয়া অন্যকে বিবাহ করে। এ যেন পরকীয়া প্রেমের প্যারডি!"

এবম্বিধ বিচারবোধে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার শেষ ভাগে পদাবলীর বিলীয়মান প্রভাবের কারণ বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা যে উপেক্ষিত হবে তা সহজেই বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত কবির ওপর উপনিষদের প্রভাব, বোদ্‌লেয়ার প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য কবিদের প্রভাব ইত্যাদি জাতীয় প্রবন্ধাদিতে চিন্তার যে অসংযম ও দায়িত্বহীনতা লক্ষ্য করা গেছে, শ্রীবিমান-বিহারী মজুমদারের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাবমূলক সম্পর্ক বিষয়ক রচনাটি তা থেকে মুক্ত নয়। তাঁর মতো প্রবীণ বিচক্ষণ পণ্ডিত ব্যক্তির কাছ থেকে এই হিড়িকে আমরা কিছুটা স্থৈর্যই আশা করেছিলাম।

বইটিতে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'পদরত্নাবলী' সংযোজিত হয়েছে, এই অংশটিই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান।

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বাল্মিকী রামায়ণ। আশালতা সেন। প্রাপ্তিস্থান: সৃজনী। তিন টাকা পঞ্চাশ ন. প.।

শ্রীযুক্তা আশালতা সেন বিরচিত, শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রকাশিত 'বাল্মীকি রামায়ণ', যুদ্ধকাণ্ড, সারাংশের পদ্যানুবাদ পড়িলাম। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই ভালো, দামও জনসাধারণের পক্ষে সুলভই বলিতে হইবে।

মহর্ষি বাল্মীকি রচিত 'রামায়ণ'-এর অনুবাদ আংশিক ও পূর্ণাঙ্গ গদ্যে ও পদ্যে এতাবৎকাল অনেকগুলিই আছে। 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' ভারতীয় মানসের গঠনোপাদানের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিলে অধিক বলা হয় না। সেই মহাগ্রন্থের জনপ্রিয় পদ্যানুবাদ বাঙলাতেও আছে, হিন্দীতেও আছে। এখনও বাঙলার ঘরে ঘরে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' পয়ার ছন্দে পঠিত ও শ্রুত হইয়া থাকে। মুসলমান আমলেও তাহার সমাদর কম ছিল না। বহু প্রাচীন কাল হইতেই বাঙলাদেশে রামায়ণের অনুবাদ ইতিহাস পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্তা আশালতা সেনও পূর্বোক্ত ধারার অনুসরণ করিয়া এই নূতন প্রচেষ্টা করার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

লেখিকা সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞা, এজন্য তাঁহার অনুবাদ প্রায়শই মূলের সংস্কৃতানুগ। ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ করিলেও লেখিকা দীর্ঘমাত্রা ও ছন্দে স্বকীয় একটি বিশেষ ধারা অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাতে এই পদ্যানুবাদ বিশিষ্টরূপে মূলরচনার মতোই প্রতিভাত হইতেছে। কদাচিৎ মূলানুগ অনুবাদ হয় নাই এমনও পরিলক্ষিত হয়—সেখানে মাত্র ভাবানুসরণ বা ছায়ানুবাদ করা হইয়াছে। এবিষয়ে আদিকাণ্ড, ১ম সর্গ শ্লোক ৮৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। এরূপ কয়েকস্থলে আছে। সম্ভবত তাহা অনুবাদের সৌকর্যরক্ষার্থ অপরিহার্য বোধেই করা হইয়াছে।

বইখানিতে একটু নূতনত্ব আছে। 'বাল্মীকি রামায়ণ'-এর বিশালতা পরিহার করিয়াও লেখিকা উক্ত গ্রন্থের সমগ্রতা তাঁহার অনুবাদের মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন; আদিকাণ্ডের প্রায় সমস্তটা মূল ও তাহার অনুবাদের মাধ্যমে, প্রস্তাবনারূপেই বাল্মীকি 'রামায়ণ'-এর মূল ঘটনার বিন্যাস করা হইয়াছে; আর, তাহার পরে যুদ্ধকাণ্ডের স্থান; যুদ্ধকাণ্ডের কিয়দংশের মূল এবং সমস্তটির অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। সমগ্রতার প্রয়োজনেই হয়তো এরূপ বিন্যাস লেখিকা সুচিন্তিতভাবে করিয়াছেন। তবুও মনে হয় অংশত মূল এবং কিছুটা অনুবাদ এই ভাবে নির্বাচন না করিলে হয়তো গ্রন্থের উৎকর্ষ আরো বাড়িত। অবশ্য গ্রন্থের কলেবর তাহাতে বাড়িত সন্দেহ নাই। কোথাও কোথাও মূল আছে আবার সর্বত্র নাই এরূপ প্রণালী অনুসরণ করায় বুদ্ধি বা চিন্তার মধ্যে একটু অসুবিধা ঘটে। এজন্য, লেখিকার কাছে অনুরোধ করি, পরবর্তী সংস্করণে তিনি যেন সমগ্র মূল ও তাহার অনুবাদ দেন, নতুবা মূল একেবারে বর্জন করেন। দুই পদ্ধতির যে কোনও একটি রাখিলে তাঁহার গ্রন্থের সমাদর বাড়িবে বই কমিবে না।

অরুণা হালদার

নীলনদের তীরে লেখক সম্মেলন

কায়রোতে আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়ে গেল ফেব্রুয়ারি মাসে। ভারতবর্ষের লেখকদের নেতৃত্ব করেছেন ডঃ মুল্‌করাজ আনন্দ। বাংলাদেশ থেকে গিয়েছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। প্রথম আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল তাশখন্দে, দু বছর আগে। সেখানে ভারতীয় লেখক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেছিলেন বাংলাদেশের সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। অবশ্য তাশখন্দ সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখা দিয়েছিল বলে শোনা গিয়েছিল। সম্মেলনে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী প্রস্তাবের খসড়ায় নিরপেক্ষ ভারতের প্রতিনিধিদলের নেতা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের গন্ধ পেয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক অত্যাচারে ধর্ষিত এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষের প্রতিনিধিরা ভারতের এই বিস্ময়কর নিরপেক্ষতায় সেদিন অবাক হয়েছিলেন। সাহিত্যে রাজনীতিকে যাঁরা এড়িয়ে চলেন কার্যকারণে তাঁরাই রাজনীতি আমদানি করেন এ ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে। কায়রো সম্মেলনে ভারতীয় লেখক প্রতিনিধিদলের নেতা ডঃ মুল্‌করাজ আনন্দ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে এশিয়া ও আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শাসনক্লিষ্ট মানুষের মুক্তির সপক্ষে রয়েছে ভারতের লেখকগোষ্ঠী। এ বিষয়ে নিরপেক্ষতার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। ন্যায়বিচার ও অন্যায় নিপীড়নের মধ্যে লেখকরা নিশ্চয়ই ন্যায়ের পক্ষে "কমিটেড"। সম্মেলনে নিরস্ত্রীকরণের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব নেওয়া হয়। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে বিশ্বশান্তি সংসদকে অভিনন্দন জানিয়ে বাণী পাঠানো হয়। এশিয়া ও আফ্রিকার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটি এবং আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন। বিরুদ্ধবাদীরা এই সম্মেলনকে রাজনীতির মঞ্চ বলে নিজেরাই কুটিল রাজনৈতিক চক্রান্তের সুড়ঙ্গপথে বিচরণ করবেন। কিন্তু দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিক মানবমৈত্রী সচেতন এবং মরমী শিল্পী-সাহিত্যিকদের কাছে আজকের যুগে একটি জরুরি কর্তব্য। এই দায়িত্ব লেখকের স্বাধীন অস্তিত্বের পক্ষেও আজ অপরিহার্য। কায়রোর এই সম্মেলন এশিয়া ও আফ্রিকার লেখক শিল্পীদের সেই মহান

দায়িত্ব পালনের পথ প্রদর্শন করল। ঔপনিবেশিক শাসনে ক্লিষ্ট দেশগুলির মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করবার জন্য শতাব্দী ধরে সাম্রাজ্যবাদীরা যে অপচেষ্টা চালিয়েছে তার অশুভ প্রতিক্রিয়া থেকে নিজের ভাষা ও শিল্পকে উদ্ধার করবার জরুরি কর্তব্যকর্মে লেখক ও শিল্পীদের আত্মনিয়োগের আহ্বান এই যুগের। আফ্রিকার মানুষের নিজস্ব ভাষাকে সাম্রাজ্যবাদীরা লুপ্ত করে দিয়েছিল; দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়া, মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি বহু জাতির নিজস্ব ভাষাকে বর্বর সাম্রাজ্যবাদীরা প্রায় উপভাষায় পরিণত করে তাদের জায়গায় বিদেশীভাষাকে দিয়েছিল আধিপত্য। আফ্রিকায় সোয়াহিলি ভাষার অস্তিত্বই বিপন্ন। আলজিরিয়ায় ফরাসীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পর্যন্ত আরবীভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। জাতির প্রাণসত্তাকে নষ্ট করবার এই চক্রান্তের বিরুদ্ধেই আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষা, জাতীয় স্বাধীনতা ও মানবমুক্তির উজ্জ্বল পবিত্র লক্ষ্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক মৈত্রী অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত না হওয়ার সঙ্কল্প নিয়েই দ্বিতীয় আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন কায়রোতে সমাপ্ত হয়েছে।

নাজিম হিকমেত : ৬০তম জন্মদিন

তুরস্কের বিপ্লবী কবি, বিশ্বশান্তির অক্লান্ত যোদ্ধা, মায়াকভস্কির বন্ধু নাজিম হিকমেত ষাট বৎসরে পা দিলেন জানুয়ারি মাসে। বাংলাদেশের মানুষ হিকমেতের কবিতার সঙ্গে পরিচিত। এগারো বছর আগে তিনি নিজের দেশের ফাসিস্তদের কারাগার থেকে দীর্ঘ দণ্ডভোগের পর মুক্তি পেয়ে অসম সাহসিকতায়, নিজের জীবন বিপন্ন করে, সমুদ্রে নৌকো ভাসিয়েছিলেন সমাজতান্ত্রিক দেশের উদ্দেশ্যে। সমুদ্রগামী একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের মালবাহী জাহাজ সেই নির্ভীক যোদ্ধাকে সমুদ্রবক্ষ থেকে সাদরে তুলে নেন। হিকমেতের এই চাঞ্চল্যকর মুক্তি সেদিন বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করেছিল। হিকমেত সারা দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষের ভালোবাসার ধন। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সেই তুরস্কের প্রতিক্রিয়াশীলদের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। মস্কোর প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে এসে যোগ দিলেন হিকমেত। তাঁর প্রথম নাটক '২৮শে জানুয়ারি' অভিনীত হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দিয়ে। এ সময়েই তিনি মায়াকভস্কির সংস্পর্শে আসেন। দুই

বিপ্লবী কবির মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয় তখন থেকেই। কুড়ির দশকে সাম্রাজ্যবাদের দালালরা যখন তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তখন তিনি আবার নির্বাসন নিলেন ইওরোপের দেশে দেশে, সোভিয়েত ইউনিয়নে। তুর্কী ভাষায় তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হলো বাকু থেকে। ১৯২৮ সাল স্বদেশে ফিরবার অনুমতি পেলেন তিনি। কিন্তু জাহাজ থেকে মাটিতে পা দেবার আগেই হিকমেতকে গ্রেপ্তার করা হলো। কিন্তু গণদাবিতে ভীত তুর্কী প্রতিক্রিয়াশীল সরকার সাধারণ মানুষের কবি নাজিম হিকমেতকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো। হিকমেত এবার তাঁর অগ্নিবীণায় সুর চড়ালেন। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ। বিদ্রোহের উস্কানি দেবার অভিযোগে হিকমেতকে সামরিক আদালতের সম্মুখীন করা হলো। ইতিমধ্যে তুরস্কের সঙ্গে হিটলারের জর্মনীর দোস্তি হয়েছে। গোপন বিচারে হিকমেতের কারাদণ্ড হলো আঠাশ বছর। তিনি লিখলেন :

"This time it was rather long
But life, my beloved,
Is a chain heavy with promises."

কারান্তরালে নিপীড়নের ফলে রোগাক্রান্ত কবিকে স্থানান্তরিত করা হলো হাসপাতালে। বিশ্বব্যাপী লেখক ও সংস্কৃতিবিদরা হিকমেতের প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুললেন। ১৯৫১ সালে হিকমেত মুক্তি পেলেন এবং সে সময়েই তিনি সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে চলে এসেছেন স্বাধীনতা ও মানবমর্যাদার পীঠভূমি সমাজতান্ত্রিক পূর্ব ইওরোপে। হিকমেত আজ পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের গর্ব। বিশ্বশান্তি আন্দোলনের অগ্রণী সৈনিক। কায়রোতে আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনের অন্যতম সংগঠক। এবং তিনি বলেন :

"Thus I have freed myself
From all big words
All question marks.
Calmly I entered the ranks
Of the great struggle."

মানুষের ধ্রুবতারা নাজিম হিকমেতের এই জন্মদিন আরও অনেক, অনেকদিন ফিরে ফিরে আসবে যতদিন না প্রত্যেকটি মানুষ অত্যাচার আর অবিচার থেকে মুক্তি না পাবে। হিকমেত শতায়ু হয়ে থাকবেন আমাদের মাঝখানে।

আঁরি আলেগের মুক্তি

আলজিরিয়ার লেখক ও সাংবাদিক আঁরি আলেগ ফরাসীদের কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় ১৯৫৯ সালে সাংবাদিকতার জন্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছিলেন। এই সংবাদ অনেক সংবাদপত্রেই সেদিন প্রকাশ করা হয় নি। কিন্তু পরবর্তী একটি সংবাদ না ছেপে পারে নি অনেক খবরের কাগজ। বিপ্লবী যোদ্ধা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আঁরি আলেগ ফরাসী কারাগার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি আজ চেকোস্লোভাকিয়ায় সমাজতান্ত্রিক মানুষদের সঙ্গে বাস করছেন। 'আলজের, রেপাব্লিকেন' পত্রিকার ডাইরেক্টর আঁরি আলেগকে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা ১৯৫৭ সালে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিল। বিনা বিচারে তিন বছর আটক থাকার পর অন্যান্য আলজিরীয় দেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের সঙ্গে ১৯৬০ সালে আঁরি আলেগকে সামরিক আদালতের সামনে হাজির করা হয়। ফরাসী ফাসিস্তরা আলেগকে দশ বছর কারাদণ্ড দেয়। ১৯৬০ সালের শেষ দিকে আলেগকে আলজিরিয়া থেকে ফ্রান্সের রেনেস কারাগারে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে এই অসমসাহসী, অকুতোভয় দেশপ্রেমিক আলজিরীয় সাংবাদিক ও সাহিত্যিক কারাগার থেকে পালাতে সক্ষম হন। কারাগারে কী ভাবে তাঁকে দিনের পর দিন ফরাসী ফাসিস্তদের চররা জিজ্ঞাসাবাদ করতো, কী ধরনের নির্যাতন তাঁকে সহ্য করতে হতো আলেগ তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ 'লা কোশ্চেন'-এ তার বর্ণনা দিয়েছেন। প্যারিস থেকে তাঁর আরেকটি বই বেরিয়েছে গত বছর। নাম 'প্রিজনার্স অব ওয়ার'। আলজিরিয়ার কুখ্যাত বারবারুস কারাগারে বন্দী নির্যাতনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে। আঁরি আলেগের মুক্তি আলজিয়ার মুক্তি সংগ্রামের পথে এক নির্ভীক নিশ্চিত পদক্ষেপ।

কিউবায় লেখকদের স্কুল

বিপ্লবী কিউবায় সংবাদপত্রের লেখকদের জন্য যে বিদ্যালয়টি রয়েছে সমগ্র লাতিন আমেরিকায় তা শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। বাতিস্তার আমলে কিউবায় স্বাধীন সংবাদপত্র ও লেখকের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কিউবার মুক্তির পর লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের জনতার আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে শিল্পকর্মের মাধ্যমে রূপ দিতে আহ্বান করা হয়। বিদেশে নির্বাসিত লেখক ও সাংবাদিকরা নতুন কিউবার মুক্ত আকাশের তলায়, নিজেদের জন্মভূমিতে ফিরে আসেন। একদা লোরকা এসেছিলেন

কিউবায়। সেদিন তিনি হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। আজ তিনি বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন কিউবা আমেরিকার ভূমণ্ডলে এক আশ্চর্য মুক্তির নক্ষত্র। সমগ্র লাতিন আমেরিকার অভ্রান্ত দিশারী ধ্রুবতারা। কিউবার এই সাংবাদিক বিদ্যালয়ের জন্য কাস্ত্রো সরকার একটি রোটারী প্রেস দিয়েছেন। সেখান থেকে শিক্ষার্থী সাংবাদিকরা নিজেদের দৈনিক পত্রিকা ও সাহিত্য সাময়িকপত্র প্রকাশ করে লেখায় হাতেখড়ি দিচ্ছেন। কয়েক বছর আগেও কিউবায় এটা ছিল অভাবিত। স্কুলের সাংবাদিকরা এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মুখপত্র 'আলমা মেটার' পত্রিকা প্রকাশনায় সক্রিয় সহযোগিতা দিচ্ছেন। সংবাদপত্রের পাশাপাশি রয়েছে বেতার ও টেলিভিশনে প্রচার শিক্ষণ ব্যবস্থা। কাস্ত্রো সরকার শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দেবার জন্য এই স্কুলে একটি বেতার ট্র্যান্সমিটার দিয়েছে। নতুন কিউবার সঙ্গীত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সংবাদ প্রচারিত হয় নিয়মিত এই শিক্ষার্থীদের বেতার প্রতিষ্ঠান থেকে। এই তরুণ লেখক ও সাংবাদিকদের শিক্ষা-পাঠ্যসূচীর সমাপ্তি অধ্যায়ে লিখতে দেওয়া হয় একটি ঐতিহাসিক ঘটনার রেখাচিত্র বা রিপোর্টাজ। সে ঘটনাটি হলো কাস্ত্রোর নেতৃত্বে গেরিলাবাহিনীর 'দীর্ঘ অভিযান'—সিয়েরা মেস্ত্রার পার্বত্যাঞ্চল অতিক্রম করে তারকুইনো পর্বতশীর্ষ আরোহণের কাহিনী, যেখান থেকে শুরু হয়েছিল কিউবার মুক্তি অভিযান। লেখকদের এই স্কুলের স্নাতকদের ডিপ্লোমা দেবার সময় একটি অঙ্গীকার করানো হয়। সে অঙ্গীকার মাতৃভূমির স্বার্থ ও জনগণের বিপ্লবের স্বার্থ রক্ষার জন্য। কিউবার লেখক ও শিল্পীরা সানন্দে এই অঙ্গীকার নিয়েছেন কিউবার মানুষের এই ঐতিহাসিক সাফল্যকে চিরস্থায়ী করতে।

সোভিয়েত দেশে বৃটিশ পত্রিকা

পশ্চিমীদের অপপ্রচারের বলিষ্ঠ উত্তর হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন বৃটিশ সরকারকে অনুমতি দিয়েছেন রাশিয়ায় বৃটিশ পত্রিকা প্রকাশ ও প্রচারের জন্য। রুশভাষায় এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হবে। নাম হবে 'এ্যাংগলিয়া'। সোভিয়েত ইউনিয়নে ৮৪টি শহরে এই বৃটিশ পত্রিকা প্রচারিত হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচারের জন্য পশ্চিমী দেশগুলি পত্রিকা, বেতার, টেলিভিশন সংস্থাগুলোকে অবাধ অধিকার দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ তার সমুচিত উত্তর দিয়েছে নিজের দেশে এই পুঁজিবাদী সরকারের পত্রিকা অবাধ প্রচারের সুযোগ দিয়ে। সোভিয়েত সমালোচকরা এই ছোট্ট ঘটনা থেকে অনেক গভীর তাৎপর্য আবিষ্কার করতে পারেন। রাশিয়া আজ পৃথিবীর মানুষের মহত্তম আশার প্রতীক, নিপীড়িত মানুষের সহমর্মী যোদ্ধা, তার দ্বার আজ সকলের জন্য উন্মুক্ত। কারণ তার দুর্গ আজ এমন শক্তিশালী, লিলিপুটদের সাধ্য নেই তার প্রাচীরের একটি ইটও খসতে পারে।

অরুণ দেব

না ট্য প্র স ঙ্গ

কয়েকটি অভিনয়

গত ১১ই ডিসেম্বর দশরূপক সম্প্রদায় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে তাঁদের নতুন নাটক শ্রীপরেশ ধর রচিত 'কালপুরী' মঞ্চস্থ করলেন। মৃত্যুর পর বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ কালপুরীতে বিচারের অপেক্ষায়। কালপুরীর শাসনকর্তা যমরাজ তাঁদের বিচার করছেন। নাটকের এই বিচার কাহিনীর মাধ্যমে নাট্যকার দেশের শাসক সম্প্রদায়, শাসনব্যবস্থা, তরুণসমাজ প্রভৃতি অনেক কিছুকেই সমালোচনা করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু শ্রেণীভিত্তিক সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকার ফলে নাট্যকারের সমালোচনা কোথাও সার্থক হয়ে ওঠেনি। একমাত্র ঠাণ্ডামল ঠনঠনিয়া চরিত্রটি কিছুটা স্বাভাবিক——বাকি সমস্ত চরিত্রই যুক্তিহীন বক্তব্যের আধার মাত্র। নাটকের দৃশ্য একটিই এবং দৃশ্য পারিকল্পনায় অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্বল নাটকের নিতান্তই সাধারণ অভিনয় দৃশ্যসজ্জাকে কোনো সময়েই নাটকের থিয়েটার-ভাবের সঙ্গে একাত্ম ক'রে তুলতে পারে নি। রবীন দাসের আলোকসম্পাত প্রশংসনীয়।

গত ২৪শে ডিসেম্বর মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে সুন্দরম সম্প্রদায় তাঁদের 'ফিঙ্গারপ্রিণ্ট' নাটক মঞ্চস্থ করলেন। বাংলা নাটক—কিন্তু ইংরাজী সংলাপে ভর্তি। নিতান্তই সাধারণ এক রহস্য কাহিনীর নাট্যরূপ। বিদেশী কাহিনী অনু-সরণের প্রচেষ্টা প্রকট। প্রথম ও শেষ দৃশ্যে নাট্যবস্তু কিছুটা ঘনীভূত। মধ্যবর্তী অংশে অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করে কৃত্রিম উপায়ে দর্শককে মূল রহস্য সমাধানের পথ থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। দৃশ্যসজ্জা সাধারণ পর্যায়ের। উদ্ভট আলোকসম্পাত ও সুরসংযোজনা নাটকের অগ্রগতির পথে বাধাই সৃষ্টি করেছে। অভিনয়াংশে শিল্পীদের নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজসম্পর্কবিহীন অপরাধমূলক এই নাটকের অভিনয়ে নবনাট্যের কোনো লক্ষণই উপস্থিত নয়।

গত ৮ই জানুয়ারি বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের প্রান্তিক শাখা

রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' মঞ্চস্থ করলেন। নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীবীরু মুখোপাধ্যায়। নাটকের প্রথমেই নৌকাডুবির ঠিক পরবর্তী ঘটনা। রমেশ ও কমলা ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কোন মতে তীরে এসে উঠেছে। মূল নাটক থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি দৃশ্যের মাধ্যমে এই ঘটনাকে উপস্থিত করা হয়েছে। মনে হলো নাটকের সংহতির দিকে দৃষ্টি না রেখে, দৃশ্যটির সাহায্যে আলোক-সম্পাতের কৌশল ও আলোকসম্পাতের সাহায্যে দৃশ্যটির বর্ণ সমারোহ দেখানোই একমাত্র উদ্দেশ্য। অথচ সে উদ্দেশ্যও সফল হয় নি। অযৌক্তিক আলোকসম্পাত, দৃশ্যসজ্জার দীনতা, রমেশ-কমলার শুষ্ক বসন সমগ্র উপস্থাপনাকে হাস্যকর করে তুলেছে। সমগ্র নাটকটি অল্পক্ষণ-স্থায়ী বেশ কয়েকটি খণ্ড দৃশ্যে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ড দৃশ্যও পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এর ফলে নাটকটির কোনো মুহূর্তই রবীন্দ্র রচনার গভীরতা অর্জন করে নাটকীয় সংকট মুহূর্তে পরিণত হতে পারে নি। নাটক রচনার ত্রুটির ফলে রমেশ, হেমনলিনী ও কমলা চরিত্রের অনন্তর্দ্বন্দ্ব কোথাও তাদের নিজস্ব আলোচনা-কক্ষ নিয়ে উপস্থিত নয়। অক্ষয় যেন এক খল-নায়ক—ভঙ্গি যেন বিদূষকের। অন্নদা-বাবু যেন বিবাহের ঘটক। সংলাপে সস্তা উত্তেজনা আনার চেষ্টায় যোগেনের মুখ দিয়ে যত্র-তত্র ইংরাজী কথা বলিয়ে রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করা হয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রের গতি-বিধি নিয়ন্ত্রণের কাজও ত্রুটিপূর্ণ। বিভিন্ন দৃশ্যে পাত্র-পাত্রীদের একই অবস্থানের বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি। কয়েকটি দৃশ্যে লঘুভাব অযথা প্রাধান্য পেয়েছে, এবং লঘু ভূমিকার অভিনেতারা যথাসাধ্য অতি অভিনয় করে গেছেন। নৌকাডুবির নাটকীয়-গতি পরিণতির দিকে ক্রমশ শ্লথ হয়ে এসেছে। নাট্যরূপকার নিজের ইচ্ছামতো শেষাংশকে পরিবর্তন করে নিয়ে কমলার চরিত্রমানসকে রমেশের সঙ্গে যে সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, তারই অনিবার্য পরিণতি কমলার আত্মহত্যা। নৌকাডুবি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের কমলার চরিত্র-মানস রমেশের সঙ্গে ঐ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত হবার পথে অগ্রসর হয় নি। নাট্যরূপে মূল চরিত্রমানসকে অবিকৃত রাখাই উচিত ছিল। কমলা চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন শ্রীমতী শমিতা বিশ্বাস। হেমনলিনীর ভূমিকায় শ্রীমতী চিত্রা মণ্ডল ও শৈলর ভূমিকায় শ্রীমতী রেবা রায়চৌধুরী যথাযথ। রমেশের ভূমিকায় জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় সুযোগ যা পেয়েছেন তার সদ্ব্যবহারই করেছেন। অন্নদাবাবুর ভূমিকা অতি অভিনয় দোষে দুষ্ট। সঙ্গীতে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের নাম রয়েছে। কিন্তু সেদিক

থেকেও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টের অভাব। আর আবহ সঙ্গীতের দিক থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও, হঠাৎ মাঝে কেন গীর্জার সঙ্গীত-ধ্বনি ব্যবহার করা হলে, তাও কিছু বোঝা গেল না। বিচ্ছিন্ন প্রথম দৃশ্যটি বাদে বাকি সমস্ত অংশে তাপস সেনের কাজ প্রশংসনীয়। আলোকসম্পাত কোথাও নাটককে অতিক্রম করে যায় নি।

গত ১২ই জানুয়ারি মিনার্ভা মঞ্চে ক্যালকাটা থিয়েটার্স মঞ্চস্থ করলেন বিজন ভট্টাচার্য রচিত ও পরিচালিত 'ছায়াপথ' নাটক। মহানগরীর রাজপথের এক দিকে গ্রামের ছিন্নমূল কৃষক পরিবার ও ভিক্ষাজীবীরা, আর এক দিকে পচাই মদের দোকান। এ নাটকের একটি মাত্র দৃশ্য! সেই একটি মাত্র দৃশ্যের পটভূমিকায় থিয়েটার-ভাব-সম্পন্ন আলোচনাকক্ষের মাধ্যমে ঐ চির-পথচারীর দল আর ঐ কৃষকদম্পতি নাটকীয় সংঘাতকে স্বচ্ছন্দ পরিণতির দিকে স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এ নাটকের গাঢ় তিক্ত রসে কখনো বা নির্মম কৌতুকের দীপ্তি, কখনো বা দুর্বিসহ বেদনার মর্মান্তিকতা। পেশাদার ভিক্ষাজীবীদের পাশাপাশি নিরুপায় ভিক্ষাবৃত্তির বৈপরীত্য, বিকলাঙ্গ ভিক্ষুক তরুণীর জীবনতৃষ্ণা এ নাটকের বিভিন্ন আলোচনাকক্ষকে আশ্চর্যভাবে বাস্তব করে তুলেছে। অবাস্তব ভাবাবেগকে কোথাও প্রশ্রয় দেওয়া হয় নি। পরিচালনায় পরিমিত সাংকেতিকতার আশ্রয় নিয়ে মঞ্চে বাস্তবানুগ পরিস্থিতি সৃষ্টির ফলে নাটকের প্রচ্ছন্ন আশাবাদিতার সুরটি এর আপাত-বিমর্ষতাকে সহজেই অতিক্রম করে গেছে। অভিনয়ের ক্ষেত্রে সম্মিলিত অভিনয়ের সাফল্য বিস্ময়কর। ব্যক্তিগত অভিনয়ে অন্ধ ও বিকলাঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর স্মরণীয় অভিনয় করেছেন মাতালবেশী বিজন ভট্টাচার্য। ক্যালকাটা থিয়েটার্সের 'ছায়াপথ' নবনাট্য-আন্দোলনের পুরোধা শ্রীবিজন ভট্টাচার্যের এক উজ্জ্বল শিল্পকর্মের নিদর্শন।

শৌভনিক সম্প্রদায় তাঁদের নতুন নাটক 'ল' ল' না' নিয়ে মুক্ত-অঙ্গনমঞ্চে নিয়মিতভাবে অভিনয় করে যাচ্ছেন। নাটক রচনা করেছেন শ্রীমতী নিবেদিতা দাস। নাটকের নামের প্রথম দুটি 'ল' কিন্তু বাংলা 'ল' নয়, ইংরেজী এল্-এ-ডব্লু অর্থাৎ 'ল' কথার বাংলা বানান এবং শেষের 'না'টি আদি ও অকৃত্রিম বাংলা। বাংলা ভাষায় নাট্যকারের মনোমতো নাম নিশ্চয়

খুঁজে পাওয়া যেত, এই খিচুড়ি ভাষা ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন ছিল না। বংশপরম্পরায় কোর্টঘর করে সর্বস্বান্ত হওয়ায় মেজর বিনয়েন্দ্র রায় উকিল-ব্যারিস্টার-এটর্নীর নাম সহ্য করতে পারেন না। এদিকে তাঁর দুই শিক্ষিত ছেলেই বধূ হিসাবে নির্বাচন করে বসে আছেন এটর্নী আর ব্যারিস্টারকে। এই নিয়ে সমস্যা, আর এই সমস্যার সমাধানেই এই নাটক 'ল' ল' না'। খাদ্য সমস্যা থেকে আরম্ভ করে ট্রামে-বাসে দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া পর্যন্ত সমস্ত সমস্যা ছাড়াও এই আরেকটি সমস্যা থাকতে পারে আর শৌভনিক সম্প্রদায় তাঁদের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের অন্যতমকে অর্থাৎ "কর্মশ্রান্ত ব্যথিত সমস্যা-জর্জরিত দেশবাসীকে উন্নততর জীবনে উদ্বুদ্ধ করা"কে সফল করে তোলার জন্যই এই নাটক মঞ্চস্থ করেছেন—এই দুই সত্যকে স্বীকার করে নেওয়ার পর নাটকটি উপভোগে আর কোনো বাধা থাকে না। পরস্পর বিপরীত আপাত উদ্ভট আলোচনাকক্ষকে পাশাপাশি সাজিয়ে সংলাপের মাধ্যমে হাস্যরস সঞ্চারিত করে দেওয়ার ব্যাপারে শ্রীমতী দাস ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য সমস্ত অধ্যায়ে এই ক্ষমতার প্রকাশ সমানভাবে হয় নি। ফলে নাটকটি প্রথম, তৃতীয় ও ষষ্ঠ অধ্যায়েই উপযুক্ত রুতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে, বাকি অধ্যায়গুলিতে নয়। অভিনয়ের ক্ষেত্রে নীতার ভূমিকায় নিবেদিতা দাস, রীটার ভূমিকায় বিনতা রায়, মেজর রায়ের ভূমিকায় বীরেশ মুখোপাধ্যায়, সত্যেনের ভূমিকায় গোবিন্দ গাঙ্গুলী, গোবর্ধনের ভূমিকায় অশোক মিত্র উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। রীটা-নীতার পিতা, অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ের জজসাহেবের ভূমিকাটিও সুঅভিনীত। পরিচালনা নিতান্তই সাধারণ শ্রেণীর। সম্মিলিত অভিনয়ের দিকটা সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অবস্থান-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নাটকের বিভিন্ন মুহূর্তকে গড়ে তোলার কোনো চেষ্টাই করা হয় নি। আলোকসম্পাত বৈশিষ্ট্য বর্জিত। মঞ্চসজ্জা যথাযথ।

সংবর্তক এক নতুন নাট্য সম্প্রদায়। এঁদের প্রথম প্রয়াস শ্রীমনোরঞ্জন বিশ্বাস রচিত দুটি নাটিকা 'জীবনতৃষ্ণা' ও 'আমরা অমৃত হব' এবং এই প্রথম প্রয়াসেই সংবর্তক সম্প্রদায় নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম অংশীদার রূপে স্বীকৃতি পাবার দাবি রাখেন। দুটি নাটিকাই আলোচনামূলক। অনেকের ধারণা আলোচনামূলক নাটক অভিনয়ে সাফল্য লাভ করে না। কিন্তু আলোচনা-

মূলক নাটক রচনার ও অভিনয়ের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। সংলাপ শুধু যুক্তিপূর্ণ হলেই চলবে না, অর্থের ও ধ্বনির সংঘাতের মাধ্যমে অভিনয়বহ-ও হওয়া চাই। অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও সীমাবদ্ধ গতির মধ্যে নিয়ন্ত্রিত থেকেই অভিনয় করতে হবে। বৎসরাধিককাল পূর্বে অক্‌স্‌ফোর্ড থিয়েটি্‌কাল কম্পানী বার্নার্ড শ-র 'ম্যান্ এ্যাণ্ড সুপারম্যান্' নাটকের আলোচনামূলক অংশ 'ডন্ জুয়ান্ ইন্ হেল্' নিউএম্পায়ার মঞ্চে উপরের পদ্ধতিতে মঞ্চস্থ করে আশ্চর্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

বর্তমান যুগের জটিলতার পটভূমিকায় মধ্যবিত্ত সমাজের তরুণ-তরুণীর মনের মতো করে জীবনকে পাবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রচিত 'জীবনতৃষ্ণা' নাটিকা। নাটিকার শেষে অল্পক্ষণের জন্য তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব। বাকি অংশ পরস্পরের জীবনবোধ সম্পর্কে নায়ক-নায়িকার আলোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। অথচ এই আলোচনা কোথাও নীরস তত্ত্বালোচনায় পরিণত হয় নি। সুন্দর এক প্রেমের কাহিনীর বিষাদমণ্ডিত উপসংহারকে মঞ্চে উপস্থিত করেছে। দ্বিতীয় নাটিকার বিষয়বস্তু বিশ্বশান্তি। এক অধ্যাপক, তাঁর কন্যা, ভৃত্য, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর এক মেজর ও শান্তির আবেদনপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহকারী কয়েকজন যুবক—এঁদের মধ্যেই আলোচনা। এক্ষেত্রেও আলোচনা কোথাও নীরস হয়ে ওঠে নি। প্রত্যেকটি চরিত্রমানস তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ও আলোচনাকক্ষ নিয়ে উপস্থিত হয়ে ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে নাটিকাটিকে সুস্থ উপসংহারের অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সে উপসংহার—শান্তির মধ্যেই জীবনের স্বাক্ষর, বাঁচার জন্যই শান্তির প্রয়োজন। নাটিকা দুটির রচনায় শ্রীমনোরঞ্জন বিশ্বাস উল্লেখযোগ্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অভিনয়ের ক্ষেত্রে সকলেই নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন এবং দুটি নাটিকাতেই নায়িকার ভূমিকাভিনেত্রীর অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মঞ্চের কাজ যথাযথ। নাটিকা দুটি গত ২০শে জানুয়ারী শনিবার প্রতাপচন্দ্র মেমোরিয়াল হলে মঞ্চস্থ হয়েছে।

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

'মধুর জীবন'

সাধারণের রুচি এবং শিল্পের দাবি এই দুই প্রয়োজন না মেটাতে পারলে কোনো চিত্রপরিচালকের পক্ষে দীর্ঘকাল ভালো ছবি করে যাওয়া সম্ভব নয়। সাধারণের রুচি মেটানোতে বামপন্থী শিল্পীর আগ্রহ বেশি থাকা স্বাভাবিক বলেই হয়তো বিশ্বের চলচ্চিত্র শিল্পের অনেক দিকপালই স্পষ্টত বামপন্থী। ইতালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক ফেদেরিকো ফেল্লিনি এই দলভুক্ত। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর উষ্মা এবং মানবিক সম্পর্ক আবিষ্কারের দুরূহতা তাঁর প্রিয় বিষয়-বস্তু। প্রথম ছবি 'লা স্ত্রাদা'র পর থেকেই তাঁর নাম ডে সিকা, রোসেলিনীর সঙ্গে উচ্চারিত হয়। প্রসঙ্গত মিকেলাঞ্জেলো আন্তোনিওনি ও তিনি নিও-রিয়ালিসমের যুগে রোসেলিনির কাছে কাজ শেখেন।

যদিও নিও-রিয়ালিসম কথাটির কোনো অর্থ হয় কিনা সে বিষয়ে ফেল্লিনি স্বয়ং সন্দেহ প্রকাশ করেন, তবু ফেল্লিনির ছবি তথাকথিত ইতালিয় নিও-রিয়ালিসমের গণ্ডীর বাইরে পড়ে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাস্তবকে নিয়েই ফেল্লিনির কাজ এবং বক্তব্যনিষ্ঠার দিক দিয়ে তিনি নিও-রিয়ালিস্টদের চেয়ে কিছুমাত্র হীন নন। তবে যে দীনদরিদ্র সমাজ নিয়ে ডে সিকার 'বাইসিকল থীপ্' ও 'উমবার্টো ডি' কিংবা ভিস্‌কোন্তির 'লা টেরা ট্রেমা' গড়ে উঠেছে, ফেল্লিনির শেষ ছবি 'লা দোলচে ভিতা'র বক্তব্যে তার সঙ্গে কোনো সংস্রব নেই। মানুষের মনের দারিদ্র্যই ছবিটির প্রধান উপজীব্য।

ছবিটি গতবছর কান-এ প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল। প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটিও পায়। তাছাড়া ইওরোপের বাজারে এ ছবি যত টাকা সংগ্রহ করেছে সেরকম আর কোনো ছবি সম্প্রতিকালে করেনি। ইতালীর ফিল্মের বাজার শোনা যাচ্ছে বদলে গেছে মাত্র এই একটি ছবির গুণেই। বক্তব্যনিষ্ঠ পরিচালকরা কাজ পাচ্ছেন বেশি। এদিকে আবার ইতালী ও ইওরোপ জুড়ে প্রচণ্ড বিক্ষোভ আর ধিক্কারও শোনা গেছে, ঠিক যেমন প্রসংসার ঝড়ও বর্ষিত হয়েছে এ ছবিটির ওপরে।

সাড়ে তিন ঘণ্টার ছবি সেন্সারের কাঁচির দৌলতে দু ঘণ্টার হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেচে। অনেকেই ছবিটি দেখে হতাশ হয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন দুর্বোধ্য। কারণ 'মধুর জীবন' আখ্যাত এই ছবিটিতে মধুর জীবনের

প্রতি ক্ষুরধার বিদ্রূপ ও প্রকৃত মধুর জীবনের অন্বেষা দেখাতে গিয়ে পরিচালক কাহিনী বা প্লট সম্পূর্ণভাবেই বর্জন করেছেন। দ্বিতীয়ত ছবিটির ভাষান্তর অর্থাৎ ইংরাজী ডাবিং অস্পষ্ট ও ছবিটি সেন্সরের কাঁচির প্রভাবে খণ্ডিত বা অসম্পূর্ণ। তাছাড়া এ ছবিতে পরিচালক ফেদেরিকো ফেল্লিনি নিতান্ত বক্তব্যনিষ্ঠ হওয়ায় সাধারণ পুরস্কৃত ছবি-সুলভ চমকদার দৃশ্য বা কায়দা একেবারে নেই। যা আছে তা দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। সাতটি দিন ও সাতটি রাত্রির ঘটনা পরিচালকের অসীম ক্ষমতার গুণে প্রায় সাঙ্গীতিক সংহতি পায়। এ সংহতিতে ঘটনাসূত্রের কোনো সাহায্য তো নেইই বরং ঘটনাসূত্রের আপাত আকস্মিকতায় বারবার এ সংহতিতে আঘাত পড়ে। নিজের বক্তব্যকে স্তরে স্তরে ঘটনাপারম্পর্যে গেঁথে ফেল্লিনি বিভিন্ন mood transition-এর মধ্য দিয়ে এক সামগ্রিক সংহতি এনেছেন, যেরকম সংহতি বর্তমান লেখক কোনো শিল্পমাধ্যমে দেখেননি। Picaresque কাহিনীর মাধ্যমে এরকম সংহতি সাধারণত আসে না।

ইওরোপীয় এবং ইতালিয় জীবনের সঙ্গে অপরিচিতি সত্ত্বেও 'দোলচে ভিতা' প্রচণ্ড নাড়া দেয়। মার্চেল্লো মাস্ত্রোই আনি অভিনীত মার্চেল্লো নামক এক কুৎসাজীবী সাংবাদিকের জগৎ এই 'দোলচে ভিতা'। ছবির প্রথম দৃশ্যে মনে পড়ে মিকেলাঞ্জেলো আন্তোনিওনির কথা: "There is an authentic Catholic nostalgia in Fellini's works."

একটি হেলিকপটার থেকে ঝুলন্ত এক যীশুখ্রীষ্টের মূর্তি (Christ giving alms) রোম শহরের ওপর দিয়ে ছায়া ফেলে চলে যায়। তারপরেই কেটে পরিচালক দেখান এক বোধিসত্ত্বের মুখ ও মালয়ের নাচ। সেই নাইটক্লাবে মার্চেল্লোর নির্দেশে তাঁর ক্যামেরাম্যান পাভালাচ্চো একটি যুগলের ছবি তোলে।

উদাহরণস্বরূপ দেখানো যায় এর প্রত্যেকটি কিভাবে ছবিটির সঙ্গে যুক্ত। ছবির শেষ একটি সরল মেয়ের মুখ দিয়ে, যাকে দেখে মার্চেল্লোর মনে হয়েছিল ফ্রা এঞ্জেলিকোর আঁকা দেবদূতের মুখ।

প্রাচ্যের কথা ফিরে আসে ছবির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে—স্টাইনার নামক মার্চেল্লোর বন্ধুর বাড়িতে। সেখানে যখন স্টাইনার মার্চেল্লোকে বলে "I am afraid of peace" ও নিজের ছেলে মেয়েদের দেখিয়ে বলে যে এই সমাজে বিশ্বাস রেখে সুখের ঘর গড়ে তুলো না, একা লড়াই করো—তখন বা

তার আগে শুনতে পাই স্টাইনারের এক বন্ধুর প্রাচ্যপ্রীতি ও এক প্রাচ্যদেশীয় মেয়ের গান। এখানে এবং পরের দৃশ্যে দীপ্ত Air India বিজ্ঞাপনে দেখা যায় প্রাচ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টার ব্যর্থতা।

ক্যামেরায় ছবি তোলার জন্য ক্যামেরাম্যানদের উন্মাদ প্রচেষ্টা ও গাড়ির ভেঁা ভেঁা শব্দের পৌনঃপুন্য উপস্থাপনার পর মার্চেল্লোর বন্ধু স্টাইনার-এর কাছে আমরা আসি। তার সঙ্গে দেখা চার্চে। সে বাজায় বাখের অর্গ্যান ফিউগ ইন ই মাইনর (বুক নং 3)। তার বাড়িতে পরদিন মার্চেল্লো ও তার অবিবাহিতা সঙ্গিনী অ্যানাকে দেখা যায়। সেখানকার শান্তিতে মার্চেল্লো জীবনের ভঙ্গি বদলানোর কথা বললে স্টাইনার বাধা দেয়। ফুলের মতো শিশুদের দেখিয়ে প্রশ্ন করে পরদিন ওদের জীবনে কি আছে? টেপ রেকর্ডে গৃহীত হয় স্টাইনার-এর কথা: তার সত্যি চেহারা এক আঙুলের মতো ছোট।

তারপর হঠাৎ মার্চেল্লো ও অ্যানার কলহান্ত-মিলন ভেঙ্গে আসে "That one telephone call". নিজের ছেলেমেয়েকে খুন করে স্টাইনার-এর আত্মহত্যা। আবার টেপ বাজে। পুলিশের জবাবে মার্চেল্লো বলে "perhaps he was afraid…Not in the way you mean." তারপর স্ত্রীকে সেই খবর দেওয়ার সময় ক্যামেরার ভীড়। বলিষ্ঠ নিষ্ঠুর হাতে ফেল্লিনি গড়ে তুলেছেন সম্পূর্ণ ঘটনাটি।

Syliva নামক বিখ্যাত অভিনেত্রীর রোম আগমন, মার্চেল্লোর বাবার রোম আগমন ও চা-চা নাইটক্লাবে যাওয়া, castle sequence, ও মার্চেল্লোর নতুন চাকরি (filmstan-এর advertising man) পাওয়ার জন্য স্ট্রিপটিজ সম্বলিত পার্টি ইত্যাদি আরো কয়েকটি দৃশ্য ছবিতে আছে। প্রত্যেকটি দৃশ্য উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে শুরু হয়ে নিখুঁতভাবে despair-এ গিয়ে শেষ হয়। তার মধ্যে তীক্ষ্ণ শ্লেষ পাওয়া যায়, যেমন Sylivaর শেয়াল ডাকায় বা বেড়ালপ্রীতির দৃশ্যে। তাছাড়া পাওয়া যায় সহানুভূতি। Yuonne Furneux অভিনীত ফরাসী মেয়েটি বা Anonk Aimee অভিনীত কোটি-পতি মাদেলিনা এবং সবচেয়ে বেশি মার্চেল্লোর নিজের অন্বেষা ও সে অন্বেষার একাগ্রতার অভাব ও হতাশা নিখুঁতভাবে পরিস্ফুট। নুনো রোটার সঙ্গীত, ওতেলো মারতেল্লির ক্যামেরার কাজ, গেরার্ডির (Gherardi) দৃশ্যপট—সব মিলে ফেল্লিনি এক বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করেছেন "which surge

forward in a compelling Rhythm." তাছাড়া যদিও আপাতভাবে যৌনলালসা ছবির বিষয়বস্তুর এক অঙ্গ, তবু "fellini's films have always been without sensuality. Androgynous men and women populate the world of his twilight moods." এজন্যই হয়তো কলকাতার সাধারণ দর্শকরা হতাশ ও চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

'দোলচে ভিতা' দেখার পর বোঝা যায় কেন 'Sight and Sound' বা 'Films and Filming' জাতীয় বৃটিশ কাগজ এ ছবিকে "Fellini's elaborate, repititious attack on Roman corruption and decadence. Plenty of extravagant set pieces. Not enough detachment", বলে উড়িয়ে দিতে চান (Winter 60-61, Sight & Sound)

বৃটিশ মেজাজে এরকম উলঙ্গ সত্য সহ্য করা মুস্কিল। তাই দেখি প্রবীণ সোভিয়েত পরিচালক ও সমালোচক Sergei Gerasimov-এর উচ্ছ্বাস :

"Fellini is not a mild artist ; his guiding principle is the healing of Society's ills by the bitterest of medicines. In this, his latest work, he has achieved results of a very high standard. He is not sparing of stark revolting scenes from this 'Sweet' life, against which he levels the entire emotional impact of his film." (March 1961, Soviet number, Films and Filmings)

এরকম ছবি ইওরোপে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় দেখে খুশি লাগে।

জিষ্ণু দে

একটি পৌরাণিক উপাখ্যানে সৃষ্টির বিবরণ

"শরৎকালে পরিষ্কার আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অগণ্য তারকা-পুঞ্জের মধ্যে মধ্যে সময়ে সময়ে অস্পষ্ট শ্বেতনীহারের ন্যায় কোন পদার্থ লক্ষিত হয়। দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে উহা আরও পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। সে সব আর কিছু নহে, মালমসলা সংগ্রহ রহিয়াছে, এখনও পৃথিবী বা সৌর-জগৎ গঠিত হয় নাই। নীহারের ন্যায় লক্ষিত হয় বলিয়া কেহ কেহ উহাকে নীহারিকা বলেন।"

এই লাইন কয়টি কোনো বিজ্ঞানের বই থেকে উদ্ধৃতি নয়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বাল্মীকির জয়' রচনার অংশবিশেষ। ১২৮৮ সালে—অর্থাৎ আজ থেকে আশি বছর আগে—রচনাটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। আশি বছর আগের অধিকাংশ বিজ্ঞানের বই এতদিনে অচল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই বইয়ে কথাপ্রসঙ্গে এমন কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অবতারণা আছে যা আজকের দিনেও তথ্যমূল্য হারিয়ে ফেলেনি। তাই বলে 'বাল্মীকির জয়' কোনো ক্রমেই বৈজ্ঞানিক রচনা নয়। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এই রচনা সম্পর্কে বলেছেন, "দুঃখের বিষয়···আমি বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, এখানি কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থ। ইহা পদ্যে লিখিত নহে, সুতরাং সমালোচক সম্প্রদায় ইহাকে কাব্য বলিবেন না। ইহা নাটক নহে, আমি নিশ্চিত জানি ; কেন না, ইহা কথোপকথনে বিন্যস্ত নহে। ইহাকে নভেলও বলিতে পারিলাম না, কেন না, ইহাতে নায়ক নাই, নায়িকা নাই, ভালবাসা নাই, কোর্টসিপ নাই, বিবাহ নাই, লুকোচুরি মারামারি খুনোখুনি কিছুই নাই। ইহাতে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কথা আছে, কিন্তু পুরাণ নহে ; দিগ্বিজয়ের কথা আছে, কিন্তু ইতিহাস নহে ; একটি সৃষ্টির বিবরণ আছে, কিন্তু বিজ্ঞান নহে ; নক্ষত্র-নীহারিকার কথা আছে, কিন্তু জ্যোতিষ নহে ; মনুষ্যকে পশু করিবার কথা আছে, অথচ 'Origin of Species' নহে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিশ্চিত একটা কিম্ভূত কিমাকার পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন।"

কিম্ভুতকিমাকার হোক, কিন্তু আশি বছর পরেও স্বীকার করতে হবে পদার্থটির রচনাসৌকর্য অতুলনীয়। শুধু কল্পনাশক্তির নিদর্শন হিসেবে নয়,

একটি পৌরাণিক উপাখ্যানকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপস্থাপনার সার্থকতম দৃষ্টান্ত হিসেবেও।

এই রচনায় একটি সৃষ্টির বিবরণ আছে। একটি পৌরাণিক উপাখ্যানে সৃষ্টির বিবরণে আধুনিক বিজ্ঞানকে আশ্রয় না করলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। কিন্তু একজন সার্থক লেখককে দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেও অবশ্যই সমকালীন হতে হবে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের এই রচনাতেও সমকালীনতার সমস্ত লক্ষণ পুরোমাত্রায় পরিস্ফুট। এবং এই কারণেই রচনাটি কালোত্তীর্ণ।

প্রমাণ হিসেবে এই পৌরাণিক উপাখ্যানের সৃষ্টির বিবরণটিকে আধুনিক বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখা যেতে পারে। বিবরণের শুরু এইভাবে :

"যে দিন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মা ও ব্রহ্মর্ষিবর্গের সহিত বিবাদ করিয়া ধবলগিরির উচ্চশৃঙ্গে আরোহন করেন, সেই দিন প্রথমতঃ ঐ সকল নীহারিকা তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ শূন্যপথে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। তীরের ন্যায়, বাষ্পীয় শকটের ন্যায়, তড়িতের ন্যায় রাজর্ষি বিশ্বামিত্র আকাশ পথে গমন করিতে লাগিলেন। প্রতিমুহূর্তে শত সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। নিজে তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ, তৎপশ্চাত আগুল্‌ফ বিলম্বিত পিঙ্গলবর্ণ জটাজুটভার। সূর্য্যকিরণে ঝক্‌ঝক্ ঝক্‌ঝক্ জ্বলিতেছে। দিবসে দেখিয়া পৃথিবীস্থ লোক অকাল উল্কাপাতবৎ মনে করিতে লাগিল।"

শূন্যপথের গতিকে তিনটি উপমার সাহায্যে বোঝানো হয়েছে—তীরের ন্যায়, বাষ্পীয় শকটের ন্যায়, তড়িতের ন্যায়। এই উপমা তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ। আশি বছর আগে নিশ্চয়ই ফোটোন রকেটের কথা জানা ছিল না, কিন্তু বিপুল মহাশূন্যকে অতিক্রমণের জন্যে তড়িত-বেগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত ছিল। আর যিনি যোগবলেই আকাশপথে গমন করতে পারেন, তেজস্ক্রিয়তা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে যাঁকে স্পেস-স্যুট গায়ে চাপাতে হয় না—তিনিও কিন্তু তড়িত-বেগটি অর্জন করেন দুটি অনিবার্য ধাপ পার হয়ে!

"সূর্য্যকিরণে ঝক্‌ঝক্ ঝক্‌ঝক্ জ্বলিতেছে।" পৃথিবী থেকে মনে হলো যেন একটি অকাল উল্কাপাত। অকাল কেন? পৃথিবীর ওপর তো সারাবছরেই উল্কাপাত হচ্ছে—কখনো বেশি, কখনো কম। অকাল সম্ভবত এই কারণে যে এই উল্কাপাতটি দিনের বেলায়, যখন আকাশের কোনো জ্যোতিষ্কই দৃশ্যমান নয়। নইলে, "সূর্য্যকিরণে ঝক্‌ঝক্ ঝক্‌ঝক্ জ্বলিতেছে"—এই দৃশ্যবস্তুটি গ্রহ

বা নক্ষত্র বা ধূমকেতু হওয়াই সঙ্গত ছিল। বশিষ্ঠ কিন্তু ধূমকেতুই ভেবেছেন।

মহাকাশচারী তিতোভ যখন পৃথিবীতে ফিরে আসছিলেন তখনকার একটি দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "ভোস্তোক-২ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘনস্তরে প্রবেশ করল। ব্যোমযানের উত্তাপ-নিরোধক খোলসটি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। উত্তপ্ত খোলসের সংস্পর্শে এসে বাতাসে আগুন ধরে গেল।...আগুনের রঙ গোড়ায় ছিল কমলা, তারপরে লালচে, তারপরে টকটকে লাল, তারপরে ঘন লাল। ব্যোমযানকে ঘিরে নানা রঙের আগুনের শিখা পাক খেতে লাগল। আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে চোখে ধাঁধা লেগে গেল আমার।"

এই সময়ে ভোস্তোকের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর মানুষ কিন্তু অনায়াসেই মনে করতে পারত যে অকালে উল্কাপাত হচ্ছে। তবুও দুটি দৃশ্য এক নয়। "সূর্য্যকিরণে ঝক্‌ঝক্ ঝক্‌ঝক্ জ্বলিতেছে"—এই জ্বলা কিন্তু বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণ-জনিত নয়, সূর্যের আলোর প্রতিফলন মাত্র। প্রতিমুহূর্তে শত সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করার ফলে এই জ্বলন্ত বস্তুপিণ্ডটির অবস্থান পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে। কাজেই উল্কাবৎ হাওয়াটা নিতান্তই একটা চোখের ভুল মাত্র।

তারপরে আছে আকাশপথের দিগ্‌নির্দেশ।

"বিশ্বামিত্র ক্রমে বায়ুপথ, ক্রমে স্থিরবায়ুপথ, ক্রমে কারণবারিপথ, ক্রমে মঙ্গলকক্ষ, ক্রমে বৃহস্পতিকক্ষ, ক্রমে সমস্ত গ্রহকক্ষ, অতিক্রম করিয়া অন্য সৌর-জগতে উপনীত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাহার গ্রহ উপগ্রহ পার হইয়া তৃতীয় সৌর-জগতে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে সৌর-জগৎ হইতে সৌর-জগৎ, তারপর কত সৌর-জগৎ পার হইয়া নিবাত, নিস্তব্ধ, নিঃসংজ্ঞ, নিঃশব্দ, অপ্রতর্ক্য অপ্রকল্প্য, শূন্যময় অনন্তে উপনীত হইলেন। উহা অনন্ত, অনাদি, গাঢ়, সুগম্ভীর, অকূল, অতল, অলঙ্ঘ্য, অপার, আকৃতিবিহীন ভীমপারাবারবৎ। আর গ্রহনক্ষাদি নাই, ক্রমে তাহারা দূরতর হইতে লাগিল।...বহুদূরে এই অনন্তমধ্যে যাইয়া তিনি ক্ষীণালোকে দেখিতে পাইলেন, কোন অলক্ষ্য কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে আবর্তক্রমে অগাধ, অসীম, অসংখ্য, অনন্ত পরমাণুরাশি ক্রমাগত ঘুরিতেছে।"

যাত্রাপথে প্রথমে পড়ছে মঙ্গলকক্ষ, তারপরে বৃহস্পতিকক্ষ, তারপরে অন্যান্য গ্রহের কক্ষ। শুক্র বা বুধের কক্ষ পাওয়া যাচ্ছে না। তার মানে, যাত্রা

যদিও যোগবলে কিন্তু তা যথেচ্ছ নয়। জ্যোতির্বিদ্যার ছক নির্ভুলভাবে অনুসরণ করে নির্দিষ্ট একটি দিকে যাত্রাপথটি প্রসারিত। এবং এই যাত্রাপথে সৌরজগতের পর সৌরজগৎ পার হতে হচ্ছে!

সকলেই জানেন আমাদের এই পৃথিবী একটি মাঝারি গ্রহ। আমাদের এই সূর্য একটি মাঝারি তারা। যে বিশেষ গ্যালাক্সিতে সূর্যের অবস্থান—যার নাম মিল্কি ওয়ে—সেখানে সূর্যের মতো তারা রয়েছে পনেরো হাজার কোটি। আবার, মহাকাশে গ্যালাক্সিও এই একটি নয়, আজ পর্যন্ত দূরবীণের সাহায্যে মানুষের দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত প্রসারিত তার মধ্যেই আরো অন্তত দশ কোটি। এক-একটি গ্যালাক্সির ব্যাস একলক্ষ আলো-বছর এবং মোটামুটি সমান দূরে দূরে ছড়িয়ে থেকে এই দশকোটি গ্যালাক্সি প্রায় একশো কোটি আলো-বছর ব্যাসের গোলক পরিমাণ স্থান জুড়ে আছে। এই হচ্ছে বিপুল মহাবিশ্বের অতি সংক্ষিপ্ত একটি ছবি। এই মহাবিশ্বে আমাদের সূর্যের মতো আরো কোটি কোটি নক্ষত্রের নিজস্ব গ্রহমণ্ডল আছে। আর এই কোটি কোটি গ্রহমণ্ডলের যেখানেই জীবনধারণের উপযোগী আবহাওয়া তৈরি হয়েছে সেখানেই জীবন আছে। বিশ্বামিত্র তাঁর যাত্রাপথে এমনি ধরনের অনেকগুলো গ্রহমণ্ডল পার হয়ে গিয়েছিলেন।

শেষ পর্যন্ত তিনি যে শূন্যময় অনন্তে উপস্থিত হয়েছিলেন তার বর্ণনাও অনেকগুলি বিশেষণের সাহায্যে দেওয়া হয়েছে। শূন্যময় বিশেষণটিও লক্ষ্য করবার মতো। এই শব্দটির মধ্যে যেন একটি অস্তিত্বের ঘোষণাও পাওয়া যায়। এবং শেষ পর্যন্ত এই ঘোষণাকে সত্য প্রমাণিত করেই অনন্ত পরমাণু-রাশির আবর্তন।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, গ্যালাক্সির যে বিশেষ এলাকার কথা বলা হচ্ছে তা একটি অন্ধকার নীহারিকার এলাকা। বিজ্ঞানের ছাত্ররা জানেন, প্রত্যেকটি গ্যালাক্সিতেই এমনি অন্ধকার নীহারিকার বিস্তৃত এলাকা আছে।

অতঃপর সৃষ্টির প্রক্রিয়ার সূত্রপাত।

"বিশ্বামিত্র তথায় ধ্যানবলে জানিলেন, অগাধ, অনন্ত, শূন্যগর্ভে অসংখ্য নীহারিকা আছে। তখন তিনি সেই সমস্ত নীহারিকা যোগবলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কত অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রাদি যে সেই অগঠিত পদার্থরাশি মধ্যে আকৃষ্ট হইতে লাগিল, কে বলিতে পারে? বিশ্বামিত্র অতিক্ষীণালোকে দেখিতে লাগিলেন, যেন প্রকাণ্ডকায় জলজন্তু সমূহ জলোন্মথনে ভীত হইয়া

কাচস্বচ্ছতড়াগের তলদেশে ত্রস্তভাবে কোনো নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইতেছে। অথবা যেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘখণ্ডসমূহ দুই প্রতিকূল বায়ুতে প্রতাড়িত হইয়া এক স্থানে সমবেত হইতেছে।

যখন ইচ্ছামতসংখ্যক নীহারিকা উপস্থিত হইয়াছে দেখিলেন, তখন তিনি যোগবলে সেই সমস্ত নীহারিকা একত্র করিয়া তাহাতে ঘূর্ণাগতি সমুৎপাদন করিলেন। প্রত্যেক নীহারিকা আপন কেন্দ্রে ঘুরিতে লাগিল আর সমস্ত নীহারিকা ঐককেন্দ্রিক হইয়া ঘুরিতে লাগিল। ঘূর্ণাগতি মুহূর্তে মুহূর্তে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে নিমেষে কোটি কোটি, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ, বৃন্দ বৃন্দ, খর্ব্ব খর্ব্ব, নিখর্ব্ব নিখর্ব্ব, পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ ক্রোশ ঘুরিতে লাগিল। যতই ঘুরিতে লাগিল, ততই পরমাণু সমূহ নিকটবর্ত্তী হইতে এবং ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল। ক্রমে যত অধিক ঘনীভূত হইতে লাগিল, ততই উহার উষ্ণতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত প্রকাণ্ড পরমাণুরাশি জ্বলিয়া উঠিল। পরার্দ্ধ ক্রোশ দূরে নক্ষত্র ছিল, কোথায় লুকাইয়া গেল। গাঢ়ান্ধকার ভেদ করিয়া, তমোরাশিকে নূতন পৃথিবী হইতে অপসারিত করিয়া দিয়া, চিরান্ধকার অনন্ত গর্ভগহ্বর আলোকিত করিয়া, সেই অনন্ত দিক্‌প্রসারী আলোকপরম্পরা নব নব বেশে পলে পলে ছয় কোটি ক্রোশ পর্যটন করিয়া বশিষ্ঠকে সংবাদ দিবার জন্য ধাবিত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, এ আলোক উত্তম হইয়াছে। তাঁহার সৌর-জগতের সূর্য উত্তম হইয়াছে। কোটি কল্পেও এ অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে না।"

অর্থাৎ, বোঝা যাচ্ছে, একটি নক্ষত্রের জন্ম হলো। রুশ বিজ্ঞানী শ্মিট (Schmidt) সৃষ্টি রহস্যকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার সঙ্গে এই বিবরণের আশ্চর্য মিল আছে। প্রথমত প্রয়োজন "ইচ্ছামতো সংখ্যক নীহারিকা", তারপরে "ঘূর্ণাগতি," তারপরে "আপন কেন্দ্রে" আবর্তন ও "ঐককেন্দ্রিক" আবর্তন। এই প্রক্রিয়াটি চলতে চলতেই আরো "অধিক ঘনীভূত" হওয়া, আরো অধিক "উষ্ণতা বৃদ্ধি", এবং শেষ পর্যন্ত "সমস্ত প্রকাণ্ড পরমাণুরাশি জ্বলিয়া" ওঠা।

নীহারিকা হচ্ছে ধুলো ও গ্যাসের মেঘ। ধুলো মানে কঠিন অবস্থার পদার্থ। এই ধুলো ও গ্যাসের মেঘে যদি একটি আবর্তন থাকে তাহলে ধুলোর কণা ও গ্যাসের কণা ঠোকাঠুকি করবেই। দুটি গ্যাসের কণার মধ্যে ঠোকাঠুকি হলে তাদের বেগ কমে না, ঠোকাঠুকি হবার আগেই

তারা দু-দিকে ছিটকে যায়। কিন্তু দুটি ধুলোর কণার মধ্যে ঠোকাঠুকি হলে তাদের বেগ কমে ও খানিকটা উত্তাপ সৃষ্টি হয়। আর ঠোকাঠুকি হবার পরে অনেক সময়ে কণাদুটো গায়ে গায়ে জুড়ে যায়। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর ধরে ধুলোর কণাগুলোর মধ্যে অনবরত ঠোকাঠুকি চলে, তাদের বেগ কমে আর গায়ে গায়ে লেগে গিয়ে জমাট বাঁধতে বাঁধতে ক্রমশ তৈরি হয় বৃহৎ একটি বস্তুপিণ্ড। এবং এই বস্তুপিণ্ডটি যতই বৃহৎ হয় ততই তার অভ্যন্তরের চাপ ও উত্তাপ বাড়ে। শেষ পর্যন্ত এই বস্তুপিণ্ড যখন এতই বৃহৎ হয়ে ওঠে যে তার ভর আমাদের এই সূর্যের ভরের কাছাকাছি না হোক অন্তত তার পঁচিশ ভাগের একভাগ—তাহলেই বস্তুপিণ্ডটি হয়ে ওঠে পুরোপুরি একটি নক্ষত্র। অর্থাৎ এ অবস্থায় বস্তুপিণ্ডের অভ্যন্তরের চাপ ও উত্তাপ এত বেশি হয় যে বস্তুপিণ্ডের হাইড্রোজেন পরমাণুর পক্ষে স্থির থাকা সম্ভব নয়, তা ফেটে যায়, আর ফেটে গিয়ে শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হয় হিলিয়াম পরমাণুতে। আর এই প্রক্রিয়ায় নিঃসৃত হয় বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক তেজ। কোটি কোটি বছর ধরে এই তেজের যোগান অব্যাহত থাকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, গ্রহ ও নক্ষত্রের তফাতটা চোখের দেখায় যাই মনে হোক না কেন, আসলে কিন্তু ভরের কম বেশি হওয়ার ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়। পৃথিবী যে নক্ষত্র হয় নি তার কারণ পৃথিবীর ভর খুবই কম। এত কম ভরের বস্তুপিণ্ডের অভ্যন্তরের উত্তাপ ও চাপ এত বেশি নয় যে পরমাণু ফাটতে শুরু করবে। পৃথিবী তো দূরের কথা, পৃথিবীর চেয়ে অনেক গুণ বড় বৃহস্পতিও গ্রহই থেকে গিয়েছে।

নক্ষত্র তৈরি হবার পরে নক্ষত্রকে ঘিরে একই প্রক্রিয়ায় একটি গ্রহমণ্ডলও তৈরি হতে পারে।

এই প্রক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে আপত্তি ওঠার কথা নয়। তখন জার্মান দার্শনিক কাণ্টের মতো অনায়াসেই যেন বলতে পারা যায়, খানিকটা মহাশূন্য (space) যদি থাকে আর খানিকটা বস্তু (matter) যদি পাওয়া যায় তাহলে গোটা একটা বিশ্ব আমরাও তৈরি করে নিতে পারি।

পৌরাণিক উপাখ্যানের বিশ্বামিত্রও স্পেস ও ম্যাটার দুই-ই পেয়েছিলেন। ফলে সৃষ্টি হয়েছিল পৃথক একটি বিশ্ব।

"কিয়ৎক্ষণ জলিতে থাকিলে বিশ্বামিত্র বলিলেন, "বুধ হউক," এমনি সেই

ঘূর্ণ্যমান জলন্ত পদার্থ হইতে এক খণ্ড বাহির হইয়া গিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া উহারই চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল এবং ক্রমে শীতল হইয়া বুধগ্রহরূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, বুধ উত্তম হইয়াছে। অনন্তর কহিলেন, "শুক্র হউক," অমনি সেই জলন্ত ঘূর্ণ্যমান পদার্থরাশি হইতে আর একখণ্ড ছুটিয়া গিয়া দূরে উহারই চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, শুক্র উত্তম হইয়াছে। আবার বলিলেন, "পৃথিবী হউক," অমনি আবার সেই জলন্ত ঘূর্ণ্যমান পদার্থরাশি হইতে আর একখণ্ড ছুটিয়া গিয়া পাহাড়-পর্বত-নদ-নদী-দ্বীপ-সাগরবতী পৃথিবীরূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, এ পৃথিবীর সহিত পুরাতন পৃথিবীর তুলনা হয় না। এইরূপে সেই অগাধ পরমাণুরাশি হইতে এক এক করিয়া তিন দিনের মধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, হর্শেল, নেপচুন, উল্কা, ধূমকেতু প্রভৃতি আমাদের সৌর-জগতে যাহা-যাহা আছে, বিশ্বামিত্র তৎসমুদয়ই সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার পৃথিবী আমাদের পৃথিবী হইতে কোটি গুণে বড় হইল, সূর্য কোটি গুণে বড়। পৃথিবী হইতে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি প্রকাণ্ড দেখাইতে লাগিল।"

এখানে বলার কথা এই যে শ্মিটের তত্ত্ব অনুসারে সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি জলন্ত গ্যাসীয় অবস্থা থেকে নয়—সূর্যকে ঘিরে পাক খাওয়া ধুলো ও গ্যাসের ঠাণ্ডা মেঘ থেকে। সূর্যের বস্তুপিণ্ড থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা অংশ থেকে গ্রহমণ্ডল তৈরি হয়নি। কিন্তু এ তত্ত্ব নিতান্তই আধুনিক কালের। আশি বছর আগে প্রকাশিত একটি পৌরাণিক উপাখ্যানের সৃষ্টি-ব্যাখ্যায় এই তত্ত্ব নিশ্চয়ই আশা করা চলে না।

অমল দাশগুপ্ত

কেটি কোল্‌ভিজ্

১৯৪৫ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত ড্রেস্‌ডেন শহরে যখন কেটি কোল্‌ভিজ্ মারা যান, তখন তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে পিকাসো বলেছিলেন : শিল্পের ক্ষেত্রে নির্ভীকতম সৈনিকটিকে এবং জার্মান জনসাধারণের সবচেয়ে শক্তিশালী মুখপাত্রটিকে আমরা হারালাম।

শিল্পীজীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোল্‌ভিজ্ নির্মম সততা আর অনন্যসাধারণ শিল্পদক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন সাধারণ মানুষের সামাজিক দৈন্য আর যন্ত্রণার কথা, তাদের সংগ্রামের কথা। ১৮৬৭ সালে কোল্‌ভিজের জন্ম। ৭৮ বছর বয়সে তিনি মারা যান। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি কাল ধরে সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের, সমাজের নিচের তলার মানুষের দুঃখ-জর্জরিত জীবনের আর তাদের প্রতিরোধের জলন্ত ইতিহাস বিবৃত হয়ে আছে কোল্‌ভিজের লিথোগ্রাফ-এচিং-কাঠখোদাইগুলিতে। সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড প্রতিবাদ হিসেবে শিল্পকে ব্যবহার করা ছিল তাঁর খুব সুস্পষ্ট লক্ষ্য। এবং এর জন্যে তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছিল—নিজের জীবনের মূল্য।

কোল্‌ভিজের মহৎ শিল্পীজনোচিত সততাই তাঁকে এনে দাঁড় করিয়েছিল হিটলারী নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে একেবারে সামনের সারির সৈনিকদের দলে। ফলে, জার্মান অ্যাকাডেমি অফ আর্টস থেকে তিনি বহিষ্কৃত হন; শিল্পী হিসেবে তিনি যেসব সম্মান পেয়েছিলেন, হিটলার সে সব কেড়ে নেয়; পরে তাঁর ছবির প্রদর্শনী একেবারে বেআইনী করে দেওয়া হয়; জার্মানির সমস্ত আর্ট গ্যালারি আর মিউজিয়ম থেকে তাঁর ছবি সরিয়ে ফেলা হয়; নাৎসী পুলিসের খানাতল্লাসী লেগেই ছিল তাঁর স্টুডিওতে। শেষ পর্যন্ত অনিবার্য ভাবেই বন্দিনী হলেন কন্‌সেন্ট্রেশন ক্যাম্পের কাঁটাতারের বেড়াজালে। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এই বন্দিনী অবস্থাতেই ড্রেসডেনে কেটি কোল্‌ভিজের মৃত্যু হয় ২২শে এপ্রিল, ১৯৪৫ তারিখে দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর।

গত নভেম্বর মাসে কলকাতায় পার্ক সার্কাস ময়দানে যে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী শান্তি-মেলা বসেছিল, সেই মেলায় একটি মণ্ডপে কেটি কোল্‌ভিজের ৭০টিরও

বেশি গ্র্যাফিক রচনা দেখার দুর্লভ সুযোগ স্থানীয় চিত্ররসিকরা পেয়েছিলেন। প্রত্যেকটি ছবি দর্শকদের অভিভূত করার মতো এবং শিল্পীর সামাজিক ভূমিকার প্রশ্নটি নিয়ে যেসব শিল্পী দ্বিধাগ্রস্ত তাঁদের উপলব্ধিকে সুস্পষ্ট করে তোলার মতো।

কোল্‌ভিজের রচনাবলীতে প্রধান মর্মবস্তু হিসেবে বারে বারে এসেছে : সামাজিক বৈষম্যজনিত যন্ত্রণাবোধ; মাতৃত্ব; আর, মানুষের মুখ—যে মুখগুলির প্রত্যেকটি বিশিষ্ট ব্যক্তিচরিত্রে উদ্‌ভাসিত। শ্রমজীবী সংগ্রামী মানুষগুলির এইসব মুখ দৃঢ়তা-কোমলতায়, ঘৃণায়-প্রীতিতে, হতাশা-প্রত্যয়ে আশ্চর্য রকম জীবন্ত। মানুষের প্রতি এই শ্রদ্ধাভরা ভালোবাসা, চিত্রিত বিষয়ের সঙ্গে চিত্রীর এই আত্মসমীকরণ কোল্‌ভিজের রচনাবলীকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। তাঁর কোনো রচনাতে ভঙ্গির প্রাধান্য বিন্দুমাত্র নেই, ফর্মের দিকে চেষ্টাকৃত নজর নেই, এমন কি প্রতীকের ব্যবহারও খুব কম। বিষয়বস্তুর দুঃসহ বাস্তবতাকে জোরালো করে তুলতে গিয়ে স্বভাবতই ফিগারগুলির অঙ্গ সংস্থানকে প্রয়োজন মতো বিষমানুপাতিক (ডিস্‌টর্ট্) করে নেওয়া হয়েছে—কিন্তু তাও করা হয়েছে খুব সংযতভাবে—এতো সংযতভাবে যে কোথাও অতিনাটকীয়তা প্রশ্রয় পায় নি। চিত্রালঙ্কার বর্জন করার ফলে এবং প্রধানত ভাস্কর্যানুসারী ও ফ্রেম-নিরপেক্ষ মডেলিং-এর সাহায্যে ডৌল ও ভর আনার ফলে তাঁর ফর্ম এমন একটা সমাহৃত রূপ পেয়েছে যা দর্শকমনকে প্রবল ভাবে নাড়া দেয়।

কোল্‌ভিজ নিজে বলেছেন : খুব ছেলেবেলা থেকেই তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন "কর্মরত শ্রমিকের হারকিউলিসের মতো দেহভঙ্গি আর চলমান জনতার বর্ণাঢ্য গতিচ্ছন্দ" দেখে। তাঁর সৃষ্টির পেছনে এই হলো "প্রধান প্রেরণা।" তাছাড়া পারিবারিক সূত্রেও তিনি বিপ্লবী ভাবধারার উত্তরাধিকার পান : তাঁর পিতা ও পিতামহ দুজনেই ছিলেন মধ্য-উনিশ শতকের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। শিল্পীজীবনের গোড়াতেই কোল্‌ভিজ তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন : "স্বীকার করি শিল্পের একটা উদ্দেশ্য আছে; সমসাময়িক কালের ওপরে আমি ছাপ রেখে যেতে চাই।" এটা ছিল সেই সময়কার শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সাধারণভাবে সবচেয়ে লক্ষণীয় একটা প্রবণতা। কোল্‌ভিজ্ মেহনতী মানুষের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন দুটি উপলব্ধির ভিত্তিতে : একদিকে তাদের নিদারুণ দারিদ্র্য দেখে তিনি যেমন যন্ত্রণা ভোগ

করেছেন, অন্যদিকে তেমনি নতুন এক ঐতিহাসিক শক্তিকে তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন—যে-শক্তি মানুষের মুক্তিকে সব সময়ে পূর্ণতর করে তুলছে। কোল্‌ভিজের রচনাবলীতে তাই আমরা দেখি একই সঙ্গে দৈন্যদারিদ্র্যের দুঃসহ রূপ, অন্যদিকে মুক্তির জন্যে সংগ্রামের বীর্যময় অভিব্যক্তি।

কোল্‌ভিজের চারটি খুব বিখ্যাত চিত্রমালা হল 'তাঁতীদের বিদ্রোহ' (দুটি লিথোগ্রাফ ও চারটি এচিং); 'কৃষকদের লড়াই' (৭টি এচিং); 'যুদ্ধের খতিয়ান' (৬টি কাঠখোদাই); এবং 'প্রোলেট্যারিয়্যাট ফোলিও' (৩টি কাঠখোদাই)। প্রথম দুটি চিত্রমালা জার্মান ইতিহাসে দুটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়ের চিত্ররূপ এবং শেষোক্ত দুটি সমকালীন বিশ্বের সাধারণ ইতিহাস। এই চিত্রমালাগুলির প্রত্যেকটি ছবিই দুর্বিষহ দারিদ্র্য আর দুর্জয় প্রতিরোধ-সংগ্রামের অবিস্মরণীয় আলেখ্য। লড়াইয়ের পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত তাঁতীদের বৈঠক, বন্দুক-বর্শা-ডাণ্ডা নিয়ে তাদের মার্চ করে এগিয়ে চলা, ভাঙাচোরা তাঁতগুলির পাশে তাদের রক্তাক্ত মৃতদেহ ('তাঁতীদের বিদ্রোহ'); ধর্ষিতা কৃষকনারীর বুকভাঙা আর্তনাদ, খামারঘরে কৃষকদের বন্দুক-বারুদ মজুদ করা, সংঘর্ষ-মৃত্যু আর তারপরে বন্দী কৃষকদের ফাঁসি ('কৃষকদের লড়াই'); যুদ্ধে যাবার জন্যে তৈরি বালকবয়সী স্বেচ্ছাসৈনিক, বিধবা ক্ষুধার্ত জননী, বিধ্বস্ত ঘরবাড়ির সামনে নিঃস্ব জনসাধারণ ('যুদ্ধের খতিয়ান'); ক্ষুধার্ত বেকার শ্রমিক, মায়ের কোলে মুমূর্ষু শিশু, মিছিলের মানুষগুলির জলন্ত চোখ ('প্রোলেট্যারিয়্যাট ফোলিও')—প্রত্যেকটি ছবি আমাদের কালের জীবন্ত ইতিহাস।

কোল্‌ভিজের এই ছবিগুলি দেখে ম্যাক্সিম গোর্কি বলেছিলেন: "আমাদের কালে মেহনতী শ্রেণীর মুক্তি-সংগ্রামকে প্রথম সার্থক চিত্ররূপ দিয়েছেন এই মহৎ শিল্পী। শিল্পের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে কেটি কোল্‌ভিজের মনে কোনোদিন কোনোরকম দ্বিধা জাগে নি।"

রবীন্দ্র মজুমদার

সংস্কৃতি সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী : অজয় ঘোষের স্মরণে

নির্বাচনের উদ্যোগপর্বে আমরা যাঁকে হারিয়েছি নির্বাচনের এই শান্তিপর্বে তাঁর জন্য শোকসন্তাপ প্রকাশের সার্থকতা বিশেষ নেই। কিন্তু অজয় ঘোষের আকস্মিক বিয়োগ বিস্মৃত হবার মতো নয় এবং এই নির্বাচনে রচিত ধূলি-কর্দমের পাড়ে আরও বেশি করে তা স্মরণীয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পক্ষে রাজনীতি এত গুরুতর সাধনা যে, শিক্ষা সাহিত্যের রসোপভোগের অবকাশ তাঁর বেশি জোটে না, তা নিয়ে চিন্তা আলোচনা প্রভৃতি দূরের কথা। অজয় ঘোষের পক্ষেও সাধারণ ভাবে এই কথা সত্য। কিন্তু কমিউনিজম একটা জীবন দর্শন, সামগ্রিক সাধনা। মানুষ যে রাজনৈতিক জীব এ কথাটা অ্যারিস্টটলের আমল থেকে যেমন সত্য, মানুষ যে রসগ্রাহী জীব একথাটাও তেমনি হোমারের আমল থেকে সত্য। তাই, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পক্ষে যদিও দেশের সামাজিক রাষ্ট্রীয় রূপান্তরই ছিল প্রধান সাধনা, পৃথিবীব্যাপী মানুষের জয়যাত্রা ও ভারতীয় সংস্কৃতির রূপান্তরও ছিল তেমনি তাঁর চিন্তার বিষয়। স্বল্প করে হলেও সে ক্ষেত্রে অজয় ঘোষের যে বিনীত জিজ্ঞাসা ও সহজ সহযোগিতা লাভ করা যেত, তা বিশেষ করে মনে রাখবার জিনিস। তাঁর দৃষ্টি ছিল ব্যাপক, রসবোধ ছিল স্বচ্ছন্দ, অকৃত্রিম ছিল সাংস্কৃতিক কর্মে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। সেই সূত্রে মানুষ অজয় ঘোষকেও দেখা যেত—কোনো সময়েই কারও নিকট তিনি 'সুদূর' ছিলেন না—অমায়িক, অকপট, একান্তভাবে কর্তব্যনিষ্ঠ হলেও যুক্তিতে-স্বচ্ছন্দ আলাপে প্রীতি-সরস সুহৃদ।

জন্মসূত্রে বাঙালী হলেও জীবনসূত্রে অজয় ঘোষের স্বভাষা ছিল উর্দু, আর কর্মসূত্রে লেখ্য ভাষা ইংরেজী। যৌবনে পদার্পণ করতে না করতেই তিনি উত্তর ভারতের বৈপ্লবিক দলের অন্তর্ভুক্ত হন, তারপর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলাদির শেষে দীর্ঘকাল হাজত ভোগ করে এসে ভারতের বিপ্লবীদের অনেকেরই মতো অন্তর্ভুক্ত হন কমিউনিস্ট আন্দোলনে ও কমিউনিস্ট পার্টিতে। জাতীয় বিপ্লব যে একদিকে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবেরই প্রাথমিক রূপ, অন্যদিকে

বিশ্ব-বিপ্লবেরই এক একটি পদচিহ্ন—এ বোধ বিপ্লবের যুগে একটা অদ্ভুত কিছু নয়। বিপ্লবের নিজ নিয়মেই—যাঁরা কমিউনিস্ট নন, শুধুই চান স্বদেশের যুগোচিত উন্নয়ন—ইন্দোনেশিয়া থেকে ঘানা পর্যন্ত বহু দেশের সেই শ্রেষ্ঠ স্বদেশ প্রেমিকদের কি আমরা দেখি না এই বিপ্লবী ভূমিকায়? অজয় ঘোষের মতো লোকেরা এই জাতীয়মুক্তির তপস্যার ক্ষেত্রটিকে মানবমুক্তির তপস্যার ক্ষেত্ররূপেও উপলব্ধি করেই জীবনের ব্রত আরও মহৎ চেতনায় উদযাপন করেছেন। এটি নিশ্চয়ই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একটা গৌরবের ঐতিহ্য। আর যাঁরা কমিউনিস্ট নন, জাতীয় আন্দোলনের মহান ঐতিহ্যেই মানুষ, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের মতো তাঁরাও আন্তরিক ভাবে উপলব্ধি করেন—অজয় ঘোষের মৃত্যু একটা "জাতীয় ক্ষতি"।

জাতীয় সত্তার মধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিরও সত্তা যে নিহিত এ সত্য কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষেই অস্বীকার করার কারণ নেই। "স্বজাতির মধ্যে সর্বজাতিকে এবং সর্বজাতির মধ্যে স্বজাতিকে সত্য রূপে অনুভব" করা—ভারত ইতিহাসের এই যদি রবীন্দ্রনাথের মতে শ্রেষ্ঠ আদর্শ হয় তা হলে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতারই মূলকথা এই ভারতীয় আদর্শ। অজয় ঘোষ অন্তত নিজ জীবনে তা অনুসরণ করেছেন।

ভারতের একাধিক ভাষার সঙ্গে পরিচয় ও সমগ্র ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে আত্মীয়তা আবাল্য লাভ করায় তিনি ভারতের আধুনিক পর্বের নির্মীয়মাণ সমাজজীবন ও সংস্কৃতির জটিলতা অনুসন্ধিৎসুর মতো স্বচ্ছ দৃষ্টিতে অনুধাবন করতে পারতেন। তেমনি এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারত ইতিহাসের উদ্‌যাপনীয় ঐক্যকে স্থির চিত্তে উপলব্ধি করাও ছিল তাঁর স্বভাবগত। আমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য যে আমাদের ভারতীয় সংহতিরই আর এক পীঠ, এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না। তেমনি এই সংহতি ও বৈচিত্র্যের অদ্ভুত সাধনা যে এ যুগে একমাত্র সমাজতন্ত্রী পথেই উদ্‌যাপিত করা যায় এ বিষয়েও তিনি ছিলেন নিঃসংশয়। আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির এই 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনা'ও তাই 'সমাজতন্ত্রী মানবতার'ই ভারতীয় সাধনা। এ মানবতা অবশ্য কোনো একটা মতবাদ বা ডগমা নয়, একটা সাধনা। অদূরস্থিত মৃত্যুর ঘনায়মান ছায়ায় দাঁড়িয়েও অজয় ঘোষ দিল্লীর 'জাতীয় সংহতি সম্মেলন'-এ শান্ত সুস্থির আন্তরিকতায় সমস্যা ও সমাধানের যে আলোচনা উত্থাপন করেন উদ্যোক্তাদের মধ্যে তা অনুসরণ করবার মতো অভিপ্রায়

ছিল কিনা জানি না। কিন্তু তা অনুধাবন করার ইচ্ছাটুকু থাকলেও এই নির্বাচনের মধ্যে ধূলিকর্দমের ঝড় এমন ভাবে উত্থিত হতে পারত না। আর নির্বাচনের শেষে দেখতে হত না উত্তর ভারতের আকাশ ছাওয়া সামন্ত আঁধি, আর সমস্ত ভারতে আসাম থেকে তামিলনাদ পর্যন্ত ক্রমঘনায়িত আত্মনাশের অপছায়া।

নির্বাচনের শেষেও তাই অজয় ঘোষকে স্মরণ করি শুধু শোকার্ত হৃদয়ে নয়—শ্রদ্ধার ও শান্ত সাহসের সঙ্গে—কী জাতীয় ক্ষেত্রে, কী আন্তর্জাতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে—তাঁর নিরাভিমান ঐক্য-সাধনা একটি মূল্যবান ঐতিহ্য।

সজনীকান্ত দাস

বাঙালীর পক্ষে এই ১৩৬৮ সাল বহু বিয়োগ বেদনার বৎসর। গত ২৮শে মাঘ (১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২) সজনীকান্ত দাস ৬২ বৎসরের মধ্যভাগেই অকস্মাৎ হৃদরোগে ইহলোক ত্যাগ করলেন। আমাদের মতো যাঁরা তাঁর ব্যক্তিগত সুহৃদ (তাঁদের সংখ্যাও সামান্য নয়), এই বন্ধু বিয়োগ যে তাঁদের জীবনে কী শোকাবহ ব্যাপার তা পরিমাপ করা অপরের পক্ষে অসম্ভব। আত্মীয় বিয়োগ বিধুর তাঁর পরিবার পরিজনকে আমরা আমাদের ঐকান্তিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সজনীকান্তের শক্তি ছিল সুপ্রচুর—আমাদের এই কথা শুধু বন্ধুসুলভ অতিশয়োক্তি নয়। কারণ, জীবন দৃষ্টিতে, সামাজিক আদর্শে, কর্মক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে আমাদের মতো বন্ধুদেরও অনেক বিষয়েই মতান্তর সুবিদিত। তথাপি কয়েকটি বিষয়ে আমাদের সংশয় নেই—সজনীকান্ত শক্তিধর পুরুষ ছিলেন। সে শক্তির কিছু পরিচয় রক্ষিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে, রচনায়। কিন্তু তার অনেকটাই ব্যয়িত হয়েছে সাময়িক পত্রের সাময়িক ধূম্র-সমারোহে। সেখানকার সহজ-লভ্য সার্থকতায়, খ্যাতিতে এবং খাতিরে একটা মোহ ও উত্তেজনা আছে। সমকালীন সাধারণের নিকট সজনীকান্তের সেই সংগ্রামোদ্ধত পরিচয়টাই বড় হয়ে রয়েছে—সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'র বিদ্রূপ-বিশারদ সম্পাদক, বুদ্ধিতে, বিদ্যায় এবং বাক্যকৌশলে যিনি সকল খ্যাতি ও সকল ব্যক্তিত্বকে জর্জরিত করতে সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু সজনীকান্তের এইটুকুই যথেষ্ট পরিচয় নয়। অবশ্য ঐরূপ উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃতি ঘটা অনিবার্য এবং সজনীকান্তেরই

তা ঘটত। তার অপেক্ষা দুঃখের কথা—এই প্ররোচনায় সজনীকান্তের সাহিত্যশক্তি পূর্ণপ্রকাশের অবকাশ গ্রহণ করতে পারে নি। কবিযশ ছিল তাঁর জীবনের প্রধান প্রার্থনা—তিনি তা লাভ করেছেন। কিন্তু যে পরিমাণে তাঁর কবিত্বশক্তি ছিল সে পরিমাণে সেখানে তাঁর সাধনার সুযোগ হয় নি। অবশ্য ব্যঙ্গ কবিতার ও ছন্দের সরস ও অভাবনীয় কারুকর্মে তিনি যে সাফল্য অর্জন করেছেন, তা যথেষ্ট। অসামান্য স্মৃতিধর মানুষ হিসাবে গবেষণায় তাঁর অদ্ভুত যোগ্যতা ছিল এবং বাঙলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম পর্বের আলোচনায় তিনি সাধনা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সাহিত্য সাধকদের কীর্তিকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সারথ্যে তিনি সকলের গোচর করেছেন—সজনীকান্তের এ কীর্তি অবিনশ্বর। প্রভূত কুশলতা ছিল তাঁর গদ্য রচনায়। তিনি 'সাধু'-রীতির সদর্প পথিক হলেও তাঁর হাতে বাঙলা ভাষা হাসত, নাচত, কাঁদত, কুঁদত—এবং অদ্ভুত চতুরতায় আবার সকৌতুকে আত্মসম্বরণ করতেও জানত। কিন্তু সাময়িক কর্মেই এ গদ্য অধিক উৎসর্গীকৃত হয়েছে। এবং আরও একটি কথা, যে 'সমালোচনার' জন্য তিনি বহু পরিচিত, 'শনিবারের চিঠি'র সেই সমালোচনা সূত্রে যতটা এ গদ্যের ধার পরীক্ষিত হয়েছে ততটা সাহিত্যাদর্শের ও সমালোচনা রীতির মান অবিকৃত বা পরিশোধিত হয় নি। সজনীকান্ত প্রাণেমনে রবীন্দ্রকাব্যে মুগ্ধ ছিলেন—এবং রবীন্দ্রপ্রতিভার উন্মেষের প্রমাণ-অন্বেষণে তিনি যে সাফল্য অর্জন করেছেন তা তাঁর নিষ্ঠা ও রবীন্দ্রভক্তির অক্ষয় প্রমাণ। আশ্চর্য নয় সজনীকান্ত প্রত্যেক বুদ্ধিমান বাঙালীর মতোই জীবনযাত্রায় আধুনিক পদ্ধতি মান্য করতেন। আশ্চর্য এই যে সামাজিক বিচারে বা সাহিত্য বিচারে তিনি সেই আধুনিকতাকেই করেছিলেন তাঁর বিদ্রূপের লক্ষ্য। আধুনিকতার বিরোধিতার ঐতিহ্যও বাঙলাদেশে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমল থেকেই প্রতিষ্ঠিত। সজনীকান্ত সেই ঐতিহ্যের আধুনিক এবং সুযোগ্য বাহক। এই হিসাবে রবীন্দ্র ঐতিহ্যেরই তিনি প্রতিবাদী। এই আভ্যন্তরীণ স্ববিরোধ তাঁর শক্তির সম্পূর্ণ প্রকাশের পক্ষে বাধা হয়েছে। এ কথা তাঁর কবিতা, বিশেষ করে তাঁর উপন্যাসের পাঠকেরা অনুভব করতে পারবেন। সাহিত্যের যে অগ্রগতির প্রেরণা ও পরীক্ষার প্রবণতাকে তিনি বাণবিদ্ধ করতেন তাতে তাঁর আন্তরিক বিরাগ কতটা ছিল বলা দুঃসাধ্য। অন্তত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিয়োগকালে আমরা দেখেছি সজনীকান্তের সেই অদ্ভুতশক্তি স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতা,

এবং সেই সাহিত্য প্রতিভার সবল স্বীকৃতি। এই অকৃত্রিম স্বীকৃতি বাঙলা দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে খুব সুলভ নয়।

বাঙলা সাহিত্যের বহু দিকে এই প্রবল মানুষের অভাব অনুভূত হবে। সজনীকান্তের ও 'শনিবারের চিঠি'র মূল সাহিত্যকর্ম, আদর্শ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বহু বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু যা তিনি দিয়েছেন তাঁর সে দানকে যেন আমরা অকৃত্রিম স্বীকৃতি দিই। কারণ, তা সামান্য নয়॥

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

শেষ পর্যন্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ আমাদের নিরাশ করেছেন। আমরা প্রায় বিশ্বাস করেছিলাম তিনি শতজীবী হবেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মতো যে দু-চারজন অশীতিপর বাঙালীকে দেখে আমরা আশ্বস্ত বোধ করতাম যে, বাঙালীও বার্ধক্যে অবনত না হতে পারে, তার মধ্যে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন সম্ভবত জ্যেষ্ঠ। ডাঃ যদুনাথ সরকার পূর্বেই গত হয়েছেন। এখন এই ফাল্গুনেই হেমেন্দ্রপ্রসাদকে আমরা হারালাম। দুঃখ বা শোক করবার মতো কারণ থাকত না—যদি দেখতাম বার্ধক্য এঁদের পক্ষে দুর্ভার বোঝা। হেমেন্দ্রপ্রসাদ যেরূপ দৃঢ় সতেজ পদক্ষেপে এসে সভায় সমিতিতে দাঁড়াতেন, যেরূপ স্বচ্ছন্দ দেহে ও মনে ট্রামে গিয়ে উঠতেও দ্বিধা করতেন না, আর যেরূপ অম্লান দেখতাম তাঁর বুদ্ধি, তাঁর বহু সঞ্চিত স্মৃতির ভাণ্ডার, তীক্ষ্ণ বাক্যযোজনার ও যুক্তি রচনার শক্তি, তাতে সত্যই কামনা করতাম তিনি শতজীবী হোন এবং আমাদের মনে আরও এরূপ আশ্বাস সঞ্চার করুন। আশা পূর্ণ হলো না—আমাদের বিবেচনায় অকালে তিনি তাঁর প্রিয় বাঙালী জাতিকে ত্যাগ করে গিয়েছেন। সান্ত্বনা এই—দানে তাঁর কার্পণ্য ছিল না। আজীবন তিনি বাঙলা ভাষার সেবা করেছেন—যখন রবীন্দ্রনাথও ছিলেন বাঙলা সাহিত্যের দুর্বোধ্য কবি, সেই ছাত্রজীবন থেকে হেমেন্দ্রপ্রসাদ বাঙলা সাহিত্যের উদ্যোগী ও উৎসাহী যাত্রী। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ কত অশ্রান্ত ও বিচিত্র পথেই যে তিনি সেই দিন থেকে বিচরণ করেছেন তার সংবাদ সংগ্রহ করাও আজ কঠিন। মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সেই সাহিত্য-সঙ্গীতের আসরের কথা একালের সাহিত্যিকরা অনেকেই শোনেনও নি। তবে হেমেন্দ্রপ্রসাদের প্রধানত পরিচয় সাংবাদিক জগতের জ্যোতিষ্করূপে—অরবিন্দ-বিপিন পালের সঙ্গে যিনি ইংরেজীতে সহকারিতা করেছেন, সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সেদিনের

'বেঙলী'তে কলম চালিয়েছেন, প্রথম মহাযুদ্ধে ইওরোপের রণাঙ্গণে প্রেরিত হয়েছিলেন সরকারের দ্বারা, 'বসুমতী'তে যিনি পূর্বাপর অজস্র সম্পাদকীয় লেখা লিখেছেন, আমৃত্যু ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার অধ্যাপনায় নিযুক্ত, সবচেয়ে প্রধান কথা—যাঁর স্মৃতি ছিল প্রখর, আর সযত্নে যিনি সংগ্রহ করে রেখে গিয়েছেন সংবাদপত্রের পুরনো প্রমাণমালা—আজ তাঁকে হারিয়ে মনে হলো আমরা যেন একটা জীবন্ত পাঠগৃহকে হারালাম। তাঁর সংগ্রহমালা সুরক্ষিত হলে হয় তো খেদ কতকটা মিটবে।

'ক্যাজুয়েলটি'

যুদ্ধে নাকি সত্য হয় প্রথম 'ক্যাজুয়েলটি'। ভারতীয় নির্বাচন সে অর্থে যুদ্ধ নয়। কারণ, তার অনেক আগেই সত্য একেবারে সিংহমার্কা 'সত্যমেব জয়তে' রূপে ক্যাজুয়েলটি হয়ে গিয়েছে। কাজেই নির্বাচনে তার ক্যাজুয়েলটি হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ভোটাভুটি সত্য দিয়ে হয় না, সত্য আশ্রয় করেও হয় না। হয় ক্ষমতার জন্য, অর্থ ও অনর্থকে আশ্রয় করে। অর্থ ও অনর্থের ব্যবহার সব রকমেই এ ক্ষেত্রে fair। আর যুগটা যখন দেনাপাওনার যুগ তখন কেন মনে করব অর্থটা অনর্থ, কিম্বা অনর্থ বস্তুটা নিরর্থক?

"সকল মানুষেরই দাম আছে"—তবে সাংবাদিকের থেকে বিসম্বাদিকের দাম ভোটের দিনে আরও বেশি। মানুষের থেকে অনেক বেশি দাম মর্কটের এবং সংস্কৃতির থেকে বিকৃতির। বাজারটায় যখন পড়তা তখন সংস্কৃতির ব্যাপারী কি above the battle থাকবে? আর তার চোখের সামনে দিয়ে নির্বাচনের 'বাস' সর্বজাতীয় যাত্রী নিয়ে ধূলো উড়িয়ে, পেট্রোলের গন্ধ ছড়িয়ে, যান্ত্রিক বিষাণ বাজিয়ে চলবে রাজপুরীর দিকে? আমরা অন্তত সংস্কৃতি-কর্তাদের এ রকম আচরণের কোনো তাৎপর্য খুঁজে পাই না। তাশখন্দে না হয় 'কলোনিয়ালিজম' শব্দটাই অস্পৃশ্য এবং তাতে সাহিত্যিক অধ্যাত্ম-শুচিতা বিনষ্ট হয়। কিন্তু তাই বলে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো দিন রাজনীতিকে পরিত্যাজ্য মনে করেন নি। যে বাঙালী সাহিত্যিক ও সাংবাদিকেরা সোভিয়েত-এর বোমা-বিস্ফোরণে শিউরে উঠেন, তাঁদের কেউ কেউ আবার ব্রিটিশ-মার্কিন বোমা-পরীক্ষায় এখন হয়তো রোমাঞ্চিত হন—কারণ তাঁরা রবীন্দ্র-মানবতার ঐতিহ্যবাহী। আর রবীন্দ্রনাথ যদি হিজলীর পরে মনুমেণ্টের তলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকেন, তা হলে বারাসতের মাঠেই বা

উদয়শঙ্কর-অমলাশঙ্কর ছুটে গিয়ে দাঁড়াবেন না কেন? রবীন্দ্রনাথ বাণীর পশারী, ওঁরা ভঙ্গির ব্যবসায়ী। এই বোড়ের চালের মুখে যদি মন্ত্রী মহাশয় আপনাকে বাঁচাতে উদয়শঙ্করের ফুটো নৌকোকে চাপান দেন, শম্ভুবাবুদের আড়াই-চালের অশ্ব নীতিকে আঁকড়ে ধরেন, আর মনোজবাবুদের গজ-গতিকেও বিনা অঙ্কুশেই তাড়িত করেন, তা কি তাঁদের অপরাধ? উদয়শঙ্কর রাজনীতি বোঝেন না (এ সত্য কথা কে না মানে?), তিনি মন্ত্রীনীতিরই অনুগামী (এ কথা বা কে না মানে)। এরূপেই উল্টোদিকে শম্ভু মিত্র রাজনীতি ছাড়া কিছুই করেন না, একথাও তিনি এবং সকলেই স্বীকার করবেন। তা হলে তাঁর রবীন্দ্র কবিতার আবৃত্তি ও হুমায়নী কাব্যামৃত পরিবেশন অর্থনীতি হতে যাবে কেন? আমরা বিশ্বাস করি, তাও রাজনীতি, তবে এ ক্ষেত্রে মন্ত্রীর রাজনীতি—জনসমাজের রাজনীতির থেকে অনেক বেশি যা দামী। কারণ, জনতার রাজনীতি তো কুড়ি বৎসর শম্ভুবাবু দেখেছেন, কই, কুড়ি বৎসরেও তো সে রাজনীতির কোনো ফল দেখেন নি? শুধু 'ফেলই' দেখেছেন—১৯৪৩ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত এই তো অভিজ্ঞতা। অথচ এ কালের মধ্যেই মন্ত্রীদের রাজনীতির প্লাবন তো পদবীতে-পারিতোষিকে-সম্মানে-সংগঠনে কত খ্যাত-অখ্যাত এবং কুখ্যাত—কত ক্ষেত্রকেই সুজলা, সুফলা করে তুলল। তিনি বা এমন সুফলা রাজনীতিকে আশ্রয় করতে সফল হবেন না কেন? মনোজ বসুর তো চিরদিনেরই কথা "ভুলি নাই"—"রাজনীতিও চিনি, সাহিত্যও চিনি, কিন্তু ব্যবসা ভুলি নাই।" তিনি চীনময় হোন্, স্লাবময় হোন্, বাষ্পময় হোন্—দেশে দেশে যতই ঘুরুন, যতই নাচুন, যতই হাসুন, যতই ভালোবাসুন—আহার্যপাত্রে যেমন, আহরণ ভাঁড়ার সম্বন্ধেও তেমনি তাঁর সেই একই কথা "ভুলি নাই।"

কেউ ভুল করেন নি—সংস্কৃতির থেকে বিকৃতির দামটা যখন বেশি সংস্কৃতিকে ক্যাজুয়েলটি হতেই হবে, Every man has his price. এটাই এই নির্বাচনী রাজনীতির শিক্ষা।

গোপাল হালদার

পাঠকদের প্রতি

গত সংখ্যায় আমরা 'পরিচয়'-এর দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এই সংখ্যায় তার কিছু কিছু কার্যকরী করা হয়েছে।

- নিউজপ্রিন্টের বদলে এই সংখ্যায় পুরু অ্যান্টিক কাগজ ব্যবহৃত হয়েছে।
- পৃষ্ঠা-সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।
- কয়েকটি নতুন ফিচার শুরু করা হয়েছে।
- প্রচ্ছদ-চিত্র বদলানো হয়েছে। চিত্রের একটি প্রতিলিপিও দেওয়া হয়েছে।
- রচনার মানও কিছুটা উন্নত করা গেছে।

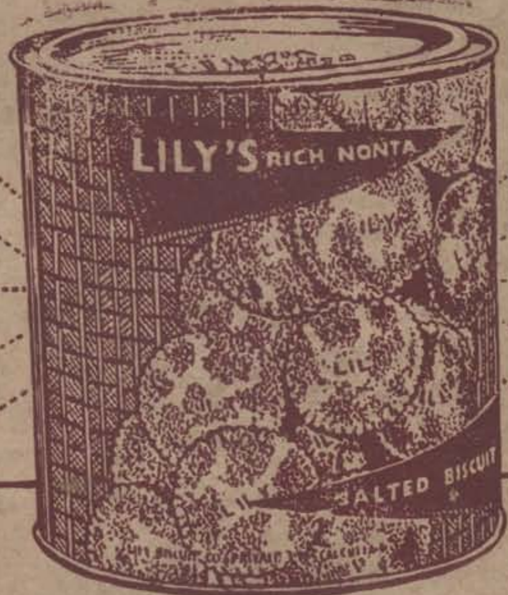
আশা করা যাচ্ছে

- পৃষ্ঠা-সংখ্যা আরও বাড়ানো যাবে।
- আরও কয়েকটি নতুন ফিচার শুরু করা যাবে।
- রচনার মান আরও উন্নত করা যাবে।
- বৈশাখ থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা যাবে।

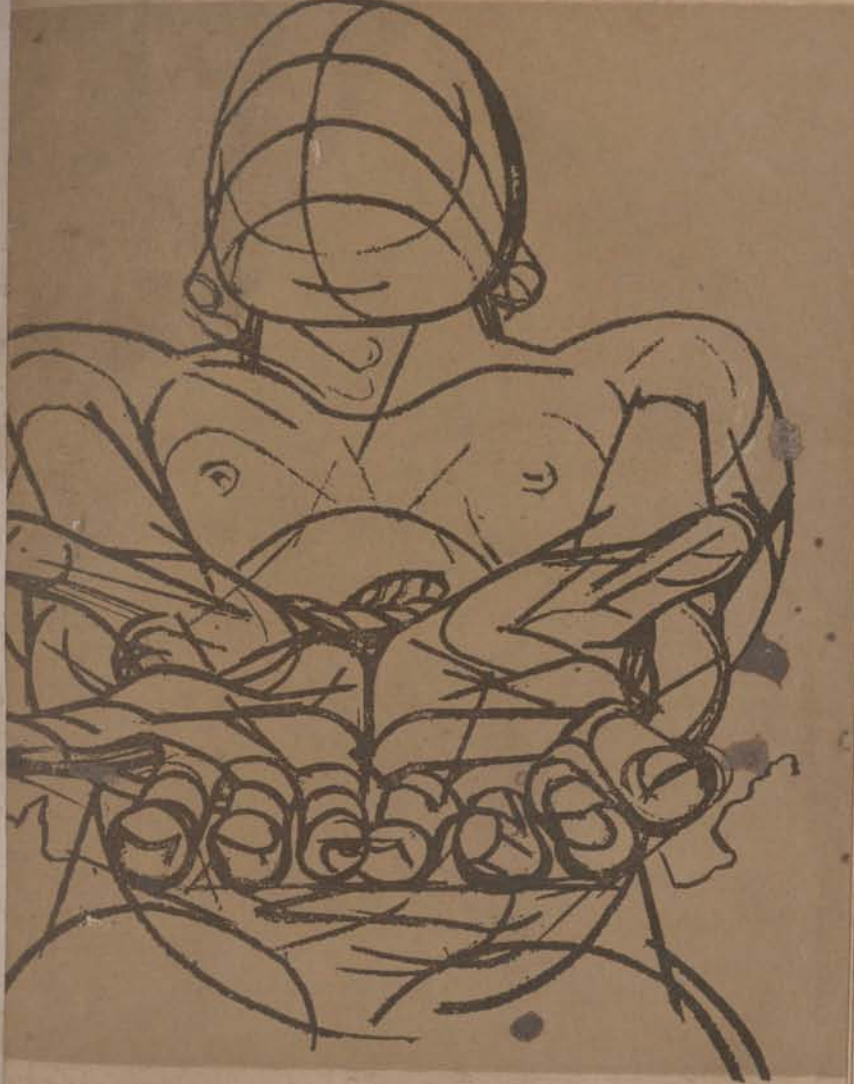
এই উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করতে গিয়ে ব্যায় অনেক বেড়েছে। চার আনা মূল্য বৃদ্ধি করেও সে ব্যায় সঙ্কুলান হবে না—যদি না 'পরিচয়'-এর বিক্রয় সংখ্যা বাড়ে

আমাদের বিজ্ঞাপনভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়। পাঠকদের কাছেই তাই আমাদের আবেদন জানাতে হচ্ছে :

আরও ভালো, আরও বড় 'পরিচয়'-এর জন্য আপনি নিজে গ্রাহক হোন। আপনার বন্ধুকে গ্রাহক করুন। উপহার হিসেবে প্রিয়জনকে 'পরিচয়'-এর গ্রাহক করে দিন।



পরিচয়



চৈত্র ১৩৬৮